বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য

সম্পাদক
নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGALI MANISAI SRI CHAITANYA
A callection of essays written by eminent personalities on Chaitanya's Life and his contributions.

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক
এস. চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
অমিয় ভট্টাচার্য

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
মোনালিসা প্রিন্টার্স
৮৩/৬/৪ বেলগাছিয়া রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩৭

পূজনীয় শিক্ষাগুরু

ড. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

শ্রীচরণেষু,—

কৃতজ্ঞতা

বাঙালী মনীষীদের চৈতন্য-সমীক্ষামূলক এ গ্রন্থে মনীষীদের প্রবন্ধ চিন্তার সংস্পর্শলাভে ধন্য হয়েছি। চৈতন্য-গঙ্গায় ভাসমান কমলদলের গৌরব তাঁদের—তাঁরা আমাদের চির নমস্য।

প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী নির্মলকুমার বসু, কানাই লাল অধিকারী, ননীগোপাল সেন শর্মা, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবপদ চক্রবর্তী, অনিলকুমার রাহা, ড. সত্য গিরি, ড. সত্যবতী গিরি, ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ড. সুভাষ শাসমল, শ্রীমান প্রবীর দাশগুপ্ত ও কল্যাণীয় শেখর গুপ্ত।

আমার পূজনীয় শিক্ষক ড. শান্তিকুমার দাশগুপ্তের সস্নেহ নির্দেশনায় এবং রত্নাবলী প্রকাশনীর শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য ও শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল।

সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের দুটি বড় ঢেউ এসেছিল—একটি মধ্যযুগে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রায় সমান্তরালে, অপরটি উনিশ শতকে, য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে।

মধ্যযুগের এই জাগরণের জোয়ার এসেছিল ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে। এই ভক্তিবাদের একটা দার্শনিক ভিত্তি ছিল—দ্বৈতবাদ। এতে শঙ্করাচার্যের জগৎ মিথ্যা-বাদের নিরসন হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতেরও সত্যতা স্বীকৃত হলে তার প্রভাব এসে পড়ল সমাজেও। জগতের স্বীকৃতির অর্থ ঐহিক জীবনের মূল্য স্বীকার এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তি-জীবনের মূল্য। অথচ সেকালের বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের মান-সম্মান নির্ভর করত তার বর্ণ বা জাতিপরিচয়ের উপর। স্বভাবত ভক্তিবাদের সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার একটা আন্তর বিরোধ আছে। শাণ্ডিল্য বা নারদের ভক্তিসূত্রে ভক্তি-মার্গে জাতিভেদ বর্জিত হলেও ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিতে রামানুজ-মধ্ব-নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ মেনেই চলা হত। এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবাদী শ্রীচৈতন্য। যে-সময়ে বলা হচ্ছিল 'অনাচারাঃ দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ ন তু শূদ্রাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ'—ব্রাহ্মণরা অনাচারী হলেও পূজ্য, কিন্তু শূদ্ররা জিতেন্দ্রিয় হলেও পূজ্য নয়, মানবধর্মের সেই ব্যভিচারের কালে চৈতন্য বললেন 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'—অর্থাৎ মানুষের গুণ বা চরিত্রই বড়, তার বর্ণ বা জাত বড় নয়। এ কেবল পুরাণ-প্রবচন উদ্ধার নয়, 'আপনি আচরি' তিনি এ ধর্ম শিখিয়েছিলেন বলে, আমরা দেখি, মুসলমান হরিদাসকে লুটিয়ে প্রণাম করছেন দ্বিজ বাসুদেব সার্বভৌম, মুখে বলছেন—'জাতিকুলান-পেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ'।

এই ভাবে চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব সমাজ মধ্যযুগের মানুষকে প্রথম ডেমক্রেসির স্বাদ এনে দিল, শাস্ত্রাচারের উপরে আসন দিল মানবিকতাকে। ব্যক্তিমানুষের এই সমুন্নত মহিমা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার বাইশ বাজারে চাবুকের ঘায়ে লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু নিষ্প্রভ হয় নি। ব্যক্তির এই সমুন্নতিই সেদিন সমাজমনের বিকাশকেও সম্ভব করে তুলেছিল। তদানীন্তন রাজশক্তির অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মশাল-মিছিল এবং নবদ্বীপের প্রতি গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে সেই মিছিলের সম্বর্ধনা—সেই সমুন্নত সমাজমনেরই পরিচয় দেয়।

সুতরাং চৈতন্যপ্রেরণাকে কেবল ধর্মদর্শনের দিক থেকে দেখলে ভুল করা হবে, সমাজের ক্ষেত্রেও তা বরাবর সক্রিয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেকালের অভ্যুত্থানটির ভিত্তি ছিল ভক্তিবাদ এবং উনিশ শতকের জাগরণের ভিত্তি যুক্তিবাদ। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় ন্যায়ের পণ্ডিত নিমাই-এর ভক্তিবাদ যে মানবতাভিত্তিক হতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল বাস্তব পারি-পার্শ্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা তথা যুক্তিবাদ। পক্ষান্তরে উনিশ শতকের রেনেসাঁসেরও মূলে

যে যুক্তিবাদ, তা ভক্তিবাদকে বর্জন করে নি। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারা হল পুরাতনের নব মূল্যায়ন। উনিশ শতকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসৃতি হয়েছে এই পথে। উনিশ শতকের মহাপুরুষ ও মনীষীরা—যাঁরাই জাতির চৈতন্যবিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, সকলেই ধরেছেন সমগ্র মানুষকে—তার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও তাঁরা বাদ দেন নি। কেননা, মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়—'রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য—বিশাল ও জটিল মানবজীবনের সকল বিভাগের সকল কর্মকে পূর্ণ করিয়াই এই বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম আপনার সিদ্ধিলাভ করে'। এই কারণেই উনিশ শতকের মনীষীরা একদিকে যুক্তিবাদী অপরদিকে ভক্তিবাদী। অবশ্য তাঁদের ভক্তিবাদে ঐতিহ্যের ইতিবাচক দিকটাই গৃহীত হয়েছিল। আবার ভক্তিতে বা যুক্তিতে, জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা বিচিত্র প্রসঙ্গে তাঁরা চৈতন্যকে এবং চৈতন্যের জীবনকর্মকে স্মরণ করেছেন। ধর্মে সাহিত্যে সঙ্গীতে চিন্তায় সমাজসংস্কারে এমন কি, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁরা চৈতন্যের জীবনকর্মের উল্লেখ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁদের সমকালীন প্রয়োজন মিটিয়েছেন। অর্থাৎ রামমোহনের তিরোভাব (১৮৩৩ খ্রীঃ)-এর ঠিক তিনশো বছর আগে (১৫৩৩ খ্রীঃ) চৈতন্যের তিরোধান হলেও, উনিশ শতকের রেনেসাঁসে এবং বর্তমান কালের মনীষীদের চিন্তায় চৈতন্য-প্রভাব ও প্রেরণা অতিশয় জীবন্ত।

চৈতন্য আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত, তাঁর জীবনকর্মের প্রভাব না পড়েছে এমন কোন কাল নেই।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে রচিত কবিকঙ্কন চণ্ডীতে যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমন্বয়ী ধর্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রেরণামূল যে কোথায় তার স্পষ্ট আভাস মেলে কবি মুকুন্দ-কৃত চৈতন্যবন্দনায়। শক্তিদেবী চণ্ডীকে মুকুন্দ বৈষ্ণবী শক্তিরূপে দেখেছেন। চৈতন্য নিজেও শক্তিদেবী প্রতিমার সামনে নতিস্তুতি করেছেন। তাঁর অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব মূলতঃ সমন্বয়েরই তত্ত্ব। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ওডিআ সাহিত্যে শূন্যবাদ ও যোগসাধনার সঙ্গে মিশে গেল চৈতন্যপ্রচারিত প্রেমভক্তিবাদ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এই সমন্বয়ী প্রেমধর্মেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের গৌরাঙ্গ পদাবলী রচনায়। এই সমন্বয় দৃষ্টির ধারাপথেই পরপর এলেন রামঃ রামশ্চ রামশ্চ—রামপ্রসাদ, রামমোহন ও রামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদ শাক্তবৈষ্ণব দ্বন্দ্বকে নস্যাৎ করে গাইলেন—'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবব বেশে বৃন্দাবনে'; রামমোহন সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়কে এক বেদীতে বসাবার জন্য স্থাপন করলেন আত্মীয়সভা; রামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয় করে বললেন 'যত মত তত পথ'।

সুতরাং, ষোড়শেও যিনি, উনিশেও তিনি—দুটি রেনেসাঁসেরই সংযোগসেতু চৈতন্য, আবার দু'টি রেনেসাঁসেরই আধেয় বস্তুরও অনেকখানি জুড়ে আছেন তিনি।

যাঁরা উনিশ শতকের রেনেসাঁসকে য়ুরোপীয় জাহাজে আমদানি করা বিশুদ্ধ বিদেশী সামগ্রী বলে মনে করেন, তাঁরা ভুলে যান, এভাবে কোন জাতির চিত্তজাগরণ হয় না। যে-গাছের গোড়াটাই নেই, হাজার বারিবর্ষণেও তার কোন কল্যাণ হয় না। য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বারিবর্ষণও নিষ্ফল হত, যদি আমাদের ঐতিহ্যের গোড়াটা না

থাকত। চৈতন্য প্রবর্তিত মানবিক আন্দোলন আমাদের ওই ঐতিহ্য-মূল। উনিশ শতকের মনীষীদের এই ঐতিহ্যাশ্রয় তাঁদের পশ্চাদ্‌গামিতা নয় বরং বলা যায় বাদ (থিসিস্) প্রতিবাদ (অ্যান্টিথিসিস্)-এর পরবর্তী স্তরে ঈপ্সিত সম্-বাদ (সিন্‌থেসিস্)। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়—'ইংরাজী পড়িয়া য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অন্তরে পুরুষানুক্রমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের ভাবটা স্বল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। ইংরাজী পড়িয়া আমরা সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। ·· এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার আশ্রয়ে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রেরণাতেই বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ আমাদের চিত্তে যে-সকল দুরূহ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈষ্ণবতত্ত্বের বৈষ্ণব সাধনার খোঁজ পাইয়াছি।'

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ রামমোহন চৈতন্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। বিদ্যাসাগরও প্রায় নীরব—কেবল দুটি ছত্র পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে। অথচ রামমোহন বিদ্যাসাগর যে কাজ করেছিলেন উনিশ শতকে, ষোড়শ শতকে সেই কর্মচিন্তারই প্রবর্তক চৈতন্য।

এই অনীহার কারণ সম্ভবতঃ সমকালীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একাংশের কার্যকলাপ, যার পরিচয় মেলে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায় :

"হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন, পূতনাবধ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটী বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন।"

রামমোহনের লোকান্তরের ৩০ বছর পরে (১৮৬২-৬৩) হুতোমের এই লেখা। স্বয়ং রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের বারশো নেড়া বারশো নেড়ী আর একশো সেবাদাসীর গল্প শুনিয়ে বলেছেন, 'চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন তারই কি রয়েছে বল দেখি?' [কথামৃত ১ম ভাগ ; ২৫ জুন, ১৮৮৪] স্বামীজী অধিকারী অনধিকারী নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে রাধা ভাব সাধনার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় 'বৈষ্ণব তখন শুক্‌না মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল, [বাঙ্গলার গীতি কবিতা, দ্বিতীয় কল্প]।

অবশ্য বিকার সর্বদা বিকার-ই। বিকৃত শবদেহ দিয়ে জীবন্তদেহের বিচার চলে না। বৈরাগী বৈরাগিনীদের সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার ১৮৭১ সালে যে-কথা বলেছেন, তাতে আবার বোঝা যায়, অনাচার-ব্যভিচার থাকলেও তা সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে গ্রাস করতে পারে নি। সম্প্রদায়ের বাইরে নারী-শিক্ষা বিস্তারে বৈষ্ণবীদের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন—"For long they were the only teachers admitted into the zananas of good families in Bengal. Sixty years ago they had already effected a change for the better in the state of female education···"

'উনিশ শতকের সাতের দশকের গোড়া থেকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়

ইতিবাচক আন্দোলন দেখা দিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে জাতিভেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হল। চৈতন্যপার্ষদ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণরা উপবীত ত্যাগ করতে লাগলেন। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের চেতনা জাগ্রত করার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমিক ক্লাব, অন্ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বহুমুখী কর্মপন্থা গৃহীত হল। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে একপয়সা দামের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় তথাকথিত 'ছোটলোক' শ্রমিক-মজুর-চাষীদের সংঘবদ্ধ হয়ে ধনীদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করার ডাক দিলেন কেশব। এইসব কাজে কেশবের ডান হাত শশিপদ ব্যানার্জী (১৮৭৪ সালে ভারতের প্রথম শ্রমিক বিষয়ক পত্রিকা 'ভারত শ্রমজীবী'র প্রতিষ্ঠাতা) বরানগরের মিল শ্রমিকদের নিয়ে নগর সংকীর্তন বার করলেন।

উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনে এইভাবে শোনা গেল চৈতন্যের সেই জাতিভেদ বিরোধী ঘোষণা—'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই'। এবং জনসংহতির ক্ষেত্রে নগর সংকীর্তনের প্রয়োগেও জয়ী হল চৈতন্য পন্থা—'সর্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন। দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন'।

কেশবের সমকালে (১৮৭১ সালে) নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে লিখেছেন—

'পরম পবিত্র আত্মা ভারত তপন
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোনার বরণ।...
দেবতা সমান তিনি লোকাতীত মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,..
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর দ্বিজ উপাসনা।'।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কলকাতার ছাত্রসভায় শ্রীচৈতন্যের সমাজ-বিপ্লব বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। এই সভায় উপস্থিত ছাত্র, পরবর্তী কালের জননেতা বিপিচন্দ্র পাল লিখেছেন—"ধর্মোপদেষ্টা না হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ আপনার রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রচারে ধর্মের উপরেই যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—ইতিহাসের এই সত্যটা উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন।"

এই সময় হিন্দু মেলার কাজকর্ম, ভারত সভার প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তার মন্ত্রপ্রচার ক্রমশঃই শিক্ষিত যুবকদের বেশী মাত্রায় আকর্ষণ করতে থাকে। হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা রাজনারায়ণ বসু এই সময় (১৮৭৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের অবদান নির্ণয় করেন এবং চৈতন্যের চরিত্র-মহিমা প্রসঙ্গে বলেন, "ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধীয় যে-সকল কার্য্য এই উনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধর্মোন্মত্ততার সাংক্রামিক গুণ প্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের রেনেসাঁসের তুলনা করে বললেন—"...যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বল

প্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেসিলিও, কাল বেকন; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল।

আমাদিগেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্য চন্দ্রোদয়; তারপর রূপসনাতন, প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্মতত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত। আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল, এ রোশানাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল?·· সকল কথা প্রমাণ কর।"

বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সমকালীন সমাজ সংস্কার (বিশেষতঃ বিধবা বিবাহ) ও রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করলেন শ্রীচৈতন্যকে—"নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বজ্রযোগিনীর পণ্ডিতেরা তাঁদের বোঝাই তূণ থেকে শাস্ত্রবচনের চোখা চোখা তীর বা অভিশাপের বজ্রনিক্ষেপ করতে পারেন, তাতে কালের অগ্রগতিকে রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যৎ আমরা জানি না, কিন্তু অতীত আমাদের নিকট খোলাগ্রন্থের মত। অতীত আমাদের বলছে, সনাতন ধর্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে রঘুনন্দন যখন হিন্দু আইন ও স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করছিলেন, তার প্রায় সমকালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি মানুষে মানুষে পুরুষে নারীতে ভেদ তুলে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মুসলমানকে দেখেছিলেন সমচক্ষে এবং নারী সমাজকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাধ্যতামূলক বৈধব্যের নিপীড়ন থেকে"। ["there rose the greatest reformer that Bengal or, India, has ever produced, the prophet of Love (Bhakti), Lord Chaitanya, who would have no distinction between man and man, or between man and woman, who treated the Brahmin, the Chandal and the Moslem alike, and enfranchised our women from the bonds of enforced widowhood."]

এইভাবে দেখা যায়, উনিশ শতকের বাঙালী এই শতাব্দীর প্রথম ছ'টি দশক ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষা আত্মসাৎ করেছে, তারপর সাতের দশক থেকে সংশ্লেষণী বুদ্ধিতে সে তার সমাজকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছে, এবং তখনই সে স্মরণ করেছে শ্রীচৈতন্যকে। শ্রীচৈতন্য এক প্রবল ইতিবাচক অনিঃশেষ প্রেরণা—এ তারই প্রমাণ। এ প্রেরণা উনিশ পেরিয়ে বিশ শতকেও সমান উজ্জ্বল।

উনিশ শতকের ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেছি। এখানে বিশেষ ভাবে বলবার কথা এই যে, ধর্ম সম্পর্কে রামমোহন-দেবেন্দ্র-বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাভাবনার আবেদন ছিল প্রধানতঃ বিদগ্ধজনের কাছে। নিতান্ত সাধারণ লোকজীবনে তাঁদের প্রভাব ছিল অল্প। এই ফাঁক ভরাট করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ভক্তিবাদী ধর্ম-সমন্বয়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রেরণা মূর্ত হয়ে উঠল এবং তা লোকজীবনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হন কেশবচন্দ্র সেন, তাঁরই প্রভাবে বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধনায় দীক্ষিত হন। বিজয়কৃষ্ণের কাছে দীক্ষা নেন বিপিনচন্দ্র পাল। আসলে

আধুনিক মানুষের সমন্বয়ী জীবনদর্শনের চাহিদা মিটিয়েছে বৈষ্ণবদর্শন এবং গিরিশচন্দ্র-বিবেকানন্দ-অশ্বিনী দত্ত-বিপিন পাল-দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈষ্ণব মানসিকতায় এই জীবনদর্শনের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। কেবল বৈদগ্ধ্যে নয়, আচরণে ও অভিব্যক্তিতে এই সমন্বয়ীভাব প্রথম মূর্ত হয় শ্রীরামকৃষ্ণে।

দেখতে দেখতে উনিশ শতকের অবসান হল। এই শতকের শেষ তিন দশকে সাহিত্যে শিক্ষায় সমাজে ধর্মে রাজনীতিতে জাতির আত্মপ্রস্তুতি চলছিল। বিশ শতকের প্রথমেই স্বরাজের দাবীতে সেই নবগঠিত জাতীয় চেতনা বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করল। আনন্দিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে পারি, যিনি ষোড়শ থেকে উনিশে ছিলেন, তিনি বিশেও আছেন অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ১১ই এপ্রিলের 'বন্দে মাতরম্' কাগজে The Demand of the Mother প্রবন্ধে অরবিন্দ চৈতন্যের আবেগ উন্মাদনা আত্মনিবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখলেন—'The perfect sense of self-abandonment which Chaitanya felt for Hari, must be felt by Bengal for the Mother·· Our passion to see the face of our free and glorified Mother must be as devouring a madness as the passion of Chaitanya to see the face of Sri Krishna.'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তো সারা মন প্রাণই অধিকার করেছিলের শ্রীচৈতন্য। 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' গ্রন্থে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যথার্থ ই লিখেছেন—"যে প্রেম ও ভালবাসা মহাপ্রভুর প্রাণে জীবন্ত, জাগ্রত জলন্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; যে প্রেমবন্যা নদীয়ায় সমুদ্ভুত হইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্লাবিত করিয়াছিল ; যে সুখ, যে পাণ্ডিত্য, যে মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল হিন্দু-মুসলমানে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেন, চিত্তরঞ্জনের জীবনেও তাহাই সার হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু তাঁহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন। মহাপ্রভুর অনুভূতি তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল এবং সেই প্রেরণায়ই চিত্তরঞ্জন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি বলিতেন—"শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় মূর্তিই আমার জীবনের পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।" এই গৌরাঙ্গ-প্রেমেই তাঁহার যৌবনের উদ্দামতা বিশুদ্ধ প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই প্রেমেই তাঁহার কীর্তন তন্ময়তা ও ভগবদ্ভক্তি, ইহার বলেই অপূর্ব ত্যাগ ও বৈরাগ্যব্রত ধারণ, এই প্রেমবলেই জাতিধর্মনির্বিশেষে সমানানুরাগ এবং ইহার ফলেই মহামানব মিলনের ভবিষ্যৎ আশা"।

দেশবন্ধুর প্রবন্ধে অভিভাষণে বার বার এসেছে চৈতন্য প্রসঙ্গ—

ঢাকায় অনুষ্ঠিত একাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে (পুস্তিকাকারে প্রকাশ ৮ এপ্রিল ১৯১৮) দেশবন্ধু বলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন এই পদ্মাতীরে তাঁর সেই অরুণ-রাঙ্গা-চরণ দুখানি রাখিয়াছিলেন, তাই—'সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে' ॥··· আর—'বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ। অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ' ॥ ...

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, 'স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।… এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাংলার যে জীবন্তপ্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি।· বাংলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল'।

আমাদের বিস্ময় বাঁধ মানে না যখন দেখি, সেই 'কনকদ্যুতি যতীন্দ্রে'র তিলেক দর্শনও যুগযুগান্তবাহী অবিনশ্বর প্রেরণার সৃষ্টি করেছে।

ষোড়শ শতকের চৈতন্যজীবনী গোবিন্দ কর্মকারের 'করচা'য় আছে—সন্ন্যাসী চৈতন্য শান্তিপুর থেকে পুরীযাত্রাপথে…'দামোদর / পার হৈয়া চলিনু মোরা কাশীমিত্রের ঘর'। চার শতাব্দী পরেও দেখা যায় দামোদর পারের মিত্রদের জীবনের লক্ষ্যই হল আতিথেয়তা; তাঁরা ভুলতে পারেন নি, একদিন সন্ন্যাসী চৈতন্য তাঁদের পূর্বপুরুষের অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—The Mittras of Nathu on the Damodar have only one aim in life, viz. hospitality. They would refuse shelter to none, and they try to make their guests as comfortable as their position permits. The spirit of Kasi Mittra, in fact, still lingers on the Damodar, even after a lapse of four centuries'. (*The Topography of Govinda Das's Diary*, Calcutta Review, 1898)।

১৫১০-১২ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভু পুরী থেকে কন্যাকুমারী, সেখান থেকে দ্বারকা পর্যন্ত গিয়ে আবার পুরী ফিরে আসেন। একেক জায়গায় ক'দিনই বা ছিলেন। অথচ সেই প্রেমময়ের স্মৃতি আজও সেখানে অম্লান! দক্ষিণ-ভারতের কন্নড় সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব আজও পায় ঐতিহাসিকের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি—"Popular songs in ragale metre by 'dasa's (mendicant singers) was another form of Vaishnava Literature in Kannada in this period. These singers got their inspiration from Madhvacarya and Vyasaraya, and the visit of Chaitanya to the South in 1510 did much to stimulate the growth of this populer type of song." (*A History of South India*, নীলকান্ত শাস্ত্রী)।

দক্ষিণ ভারতে মহীশূর ও কূর্গ অঞ্চলে 'সাতানি' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা আজও নিজেদের চৈতন্যপন্থী বলে পরিচয় দেন। "The Satani are the next most numerous religious sect.…They are votaries of Vishnu, especially in the form of Krishna, and are followers of Chaitanya.·· They call

themselves Vaishnavas, the Baisnabs of Bengal." (*Imperial Gazeteer of India*, Mysore & Coorg, 1908, p. 48)

দক্ষিণ ভারত থেকে দ্বারকায় যাওয়ার পথে ইলোরায় শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন ও নৃত্য করেছিলেন। এই শতকের প্রথম দিকে "শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় দক্ষিণ দেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন করেন। · সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে।·· সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। খোল করতাল লইয়া কয়েকজন ঐ দেশীয় বৈষ্ণব সংকীতন আরম্ভ করিলেন। রামযাদববাবু আশ্চর্যান্বিত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় কীতনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। দুই দিবসের অনুসন্ধানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণবের দর্শন পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের বাড়ি যে বঙ্গদেশে, সেই বঙ্গদেশ হইতে এই খোল করতাল ও কীর্তন আসিয়াছে"। কিরূপে আসিল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন।"

এই ঘটনা বিবৃত করে শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছেন—"পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা ও সে তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে!" (অমিয়নিমাইচরিত)।

ভারততীর্থ পরিক্রমার পর পুরীতে ফিরে এসে মহাপ্রভু ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে গৌড়যাত্রা করেন। গৌড় থেকে পুরী এসে আবার ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এ সময়কার বিবরণ আছে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'—

"ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত। কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি। সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড। ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার। চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন। বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন। সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥
শুন ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহু দেশ। বনপথে সুখের সম কাঁহা নাহি লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল। বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল॥"

এই অঞ্চলের তীর্থ ও অধিবাসী প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসু লিখেছেন—"মহাপ্রভু মহানদীর দক্ষিণ তীরবর্তী যে-পথ দিয়া পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে পথটি অপ্রসিদ্ধ হইলেও পুরাতন ছিল।·· সমগ্র মহানদীকূলে সপ্তম হইতে দশম, একাদশ বা আরও পরবর্তীকালে অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। খরোদের শবরীদেবীর মন্দির, বড়ম্বার সিংহনাথ মন্দির; শ্রীপুর, মলহার শিউরি নারায়ণ প্রভৃতি স্থানের মন্দির মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুদিন পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল এবং বিখ্যাত তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এ সকল তীর্থস্থানে রাজপ্রসাদে ব্রাহ্মণপল্লী স্থাপিত

হইলেও সিংহনাথ প্রভৃতি মন্দিরে পূজার অধিকার আজও অব্রাহ্মণ আরণ্যজাতির হস্তে আছে।

এই সকল জাতি যেমন নদীর কূলেও বাস করে, তেমনই পার্শ্ববর্তী বনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডেও বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে হয়তো কন্ধ জুয়াঙ্গ শবর প্রভৃতি জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'পরম পাষণ্ড' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।"

'জুয়াঙ্গ জাতি' প্রসঙ্গে এরপর লেখক একটি চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন। —"মহানদীর উত্তরভাগে ঢেঙ্কানাল, পাললহড়া এবং কেওনঝর নামে তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য; সেগুলি এখন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই তিন রাজ্যে জুয়াঙ্গ নামে এক জাতি বাস করে। পাললহড়াতে এখন পর্যন্ত জুয়াঙ্গদের মধ্যে একটি বিচিত্র ব্রত প্রচলিত আছে। বৎসরের মধ্যে কোনো একদিন জুয়াঙ্গগণ পাতার ঠোঙায় কিছু ফল সাজাইয়া বনের মধ্যে রাখিয়া আসে। মহাপ্রভু নাকি এক সময়ে ইহাদের নিকটে ফলভিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই প্রাচীন ঘটনার স্মৃতি আজও জুয়াঙ্গ জাতি এইভাবে বহন করিয়া আসিতেছে।" [হিন্দুসমাজের গড়ন, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৫-৬]

চৈতন্যপ্রেরণা এইভাবে সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে লোকজীবনকে আশ্রয় ক'রে কালজয়ী হয়ে আছে। স্বভাবতঃই একালের কাব্যসাহিত্যেও একটা বড় অংশ জুড়ে আছে চৈতন্য-বিষয়ক রচনা। এই জ্যোতির্ময় সত্তার দিব্যপ্রেরণা যে সত্যই অনিঃশেষ, তার নিদর্শন সাম্প্রতিকতম বাংলা সাহিত্যেও দুর্লভ নয়।

প্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একালের স্বনামধন্য সাহিত্যিক। মার্ক্সবাদে পরিশীলিত চিত্ত বলে তাঁর খ্যাতি আছে। ধর্ম আফিং—ইত্যাকার তত্ত্ব তাঁর অপরিজ্ঞাত নয়। শ্রীচৈতন্যকে তিনিও কিন্তু আফিংয়ের কারবারী বলে ভাবতে পারেন নি। তাঁর একাধিক উপন্যাসে চৈতন্যপ্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর 'সাগরিক' উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—

"হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ, চতুর্ধাম পুণ্যভূমির অন্যতম পুণ্যচূড়া নীলমাধব দারুব্রহ্মের মন্দিরের মধ্যে পা দিলাম।··

—জগন্নাথের চোখ দুটি দেখেছেন?

—দেখেছি।···

আমার দুর্ভাগ্য, মন্দিরের বদ্ধ অন্ধকার যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে, ওই চোখ দুটির চাইতেও ঢের বেশি লোভনীয় মনে হচ্ছে বাইরের আকাশভরা আলোর হাতছানি—বিকেলের জোয়ার-আসা মাতাল ঢেউয়ের মাতামাতি।·· খানিকটা এগিয়ে এক জায়গায় আমি একটা হোঁচট খেলাম।

রামকুমার হাত ধরে পতনটা রক্ষা করলেন। তাকালেন আমার দিকে, বিকেলের আলোয় তাঁর চশমার কাঁচটা জলজল করতে লাগল।

—জানেন, কী এটা?

—কী?

—গরুড় স্তম্ভ। এইখানে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন আকুল দৃষ্টিতে মহাপ্রভু তাকিয়ে থাকতেন নীলমাধবের মূর্তির দিকে, দুচোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরে পড়ত। পড়েন নি ?
"গরুড় স্তম্ভের নীচে আছে নিম্নখালে, সেই খাল ভরিল প্রভুর অশ্রুজলে।"

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম—মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ভক্তি নয়—ধর্ম নয়—কিছুই নয়। হঠাৎ এই অন্ধকার মন্দিরের ভেতর থেকে যেন একটা করুণ আর্তি, একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালা আমার চার পাশে এসে কুয়াশার মতো ঘিরে দাঁড়াতে লাগল। মনে পড়ল—কী অসহ্য আকুলতায় সেদিন ঘরসংসার সমস্ত ছেড়ে সেই 'কনকবরণ গোরা' নীলাচলের এই তীর্থপথে ছুটে এসেছিলেন। হয়তো এইখানেই ভাবের আবেগে তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন—নিঃশ্বাস ছিল না—জীবনের লক্ষণ ছিল না। মন্দিরের পুরোহিতেরা এই অনধিকারীকে আঘাত করবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন—আর সেই সময় তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন সৌম্য শান্ত এক দীর্ঘাকার মানুষ। নীলাচলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনি—তাঁর নাম বাসুদেব সার্বভৌম। তারপর :

"যে ভট্টাচার্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে। তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদে ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥
ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন। প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" ॥

কোথায় গেল দুর্জয় তার্কিক—মিথিলাবিজয়ী সেই দুর্ধর্ষ পণ্ডিত ! এই গরুড়-স্তম্ভের তলায় যে অশ্রুর বিন্দু দিনের পর দিন ঝরে পড়ল—সেই অশ্রুতে কত সার্বভৌম, কত বেদান্তবাগীশ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেলেন !

ধর্মবিশ্বাস নয়—ভাবের আবেগ নয়, একটা অপূর্ব বেদনাভরা ইতিহাস যেন মনের মধ্যে ছায়া জমাতে লাগল ! মনে হ'তে লাগল, এই অন্ধকার মন্দিরের প্রতিটি অণুতে অণুতে একটা নিঃশব্দ হাহাকার বেজে উঠেছে : হা কৃষ্ণ হা জনার্দন—মোর প্রাণনাথ !

এবার নেশা ধরবার পালা আমার। কিন্তু রামকুমারবাবুই ঘোর ভেঙে দিলেন।

—কই মশাই, আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন ? হোটেলে এন্‌গেজমেণ্ট আছে বলছিলেন না ?

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—চলুন—অপ্রতিভ হয়ে আমি পা বাড়ালাম।

মন্দির ছাড়িয়ে খানিকদূর হাঁটবার পরে রামকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, সোনার গৌরাঙ্গ দেখেছেন ?

···হেসে বললাম, না, কোথায় ?

—চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে আরো খানিকটা। যান-দেখে আসুন !

—থাক। উৎসাহ হচ্ছে না।

—কেন বলুন তো ? —রামকুমার অভয় দিলেন : ভয় নেই, সেখানে পাণ্ডাতে উপদ্রব করবে না।

—পাণ্ডার জন্যে নয়। আমি ভাবছিলাম, সনাতন গোস্বামীর গায়ে তিন টাকা দামের ভোট কম্বল পর্যন্ত যিনি সহ্য করতে পারেন নি, নিজের সোনার মূর্তি দেখে সে

সন্ন্যাসী কতটা খুশি হচ্ছেন।

রামকুমার মৃদু হাসলেন : ভক্তির ওপরে তো আর ভক্তিভাজনের হাত নেই ওটা ভক্তের এলাকায়। তারা যেমন করে খুশি তাঁর পুজো করবে।

তা বটে। তবে ভক্তির উপসর্গটা মাঝে মাঝে দেবতাকে অনেকখানি টেনে নামায়। বিশ্বনাথ মাখেন ছাই, আর তাঁর সেবায়েৎ পরেন সোনার হার। এবং যে সোনার হারের পেছনে যে-সব কাহিনী মেলে সেগুলো উহ্য থাকাই ভালো।

—আপনি দেখছি দারুণ সীরিয়াস হয়ে উঠেছেন—রামকুমার এবার সশব্দে হেসে উঠলেন।

—আপনার সঙ্গগুণে বলতে পারেন—আমি পাল্টা জবাব দিলাম : কিন্তু চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলব। তাঁর জায়গা মন্দিরে হওয়া উচিত নয়—পার্কে।

—পার্কে ? মানে ? নিন্দে করছেন নাকি ?—রামকুমার সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন।

—নিন্দে নয়। চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্ব যাই থাক, আসলে তিনি সোশ্যাল রিফর্মার। রামমোহন রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মূর্তি পার্কে বসানো উচিত—মন্দিরে নয়।

—চৈতন্যের একি বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মশাই !

—এটা ঐতিহাসিক সত্য। ওঁর সময়টা দেখুন। তিন দিক থেকে ওঁকে লড়তে হয়েছে। একদিকে মহাযান তন্ত্রের বিকৃত রূপ, অন্যদিকে অদ্বৈতবাদের মরীচিকা, আর একদিক থেকে হোসেন সাহি ঔদার্যের পথে ইসলামের জয়যাত্রা। দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছিল। চৈতন্য তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দিলেন শুধু হরিনাম জপের সোজা রাস্তায়। অভিচার ব্যভিচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পরিত্রাণ পেল 'তত্ত্বমসি'র দুর্বোধ্য শুষ্কতা থেকে। ওদিকে আচণ্ডালকে কোল দিয়ে ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর। নইলে এতদিনে দেশে একটাও হিন্দু থাকত নাকি ?

—হুঁ, বুঝেছি আপনার যুক্তি। আপনি এই জন্যেই গড়ের মাঠে মহাপ্রভুর স্ট্যাচু বসাতে বলছেন।—রামকুমার গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু হিন্দু না থাকলে সত্যিই কি কোনো ক্ষতি হত ?

আমি হাসলাম : সেটা আলাদা কথা। কিন্তু সমাজেই বলুন আর সাহিত্যেই বলুন, বাংলাদেশে চৈতন্যই প্রথম ডিমোক্র্যাসির বন্যা এনে দিয়েছেন। সে যুগে কায়স্থগুরুর পায়ের ধুলো ব্রাহ্মণ শিষ্য মাথায় রেখেছেন, তার সোশ্যাল ভ্যালু ভাবতে পারেন ? আরো সেই অদ্বৈতবাদের ভয়াবহ প্রতিপত্তির সময় ? দেখুন না—মনের বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ।"

দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথ থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত—বাঙালী মনীষী সাহিত্যিকেরা সামাজিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্য আন্দোলনের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক তুলে

ধরেছেন। এইসব মনীষী আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাদিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আধুনিক কালের প্রবুদ্ধ ব্যক্তিমনের গঠনেও তাঁদের দান অপরিসীম। এ গ্রন্থে তাঁদের উপস্থিতি—চৈতন্যকে কেন্দ্র করে হলেও, স্বমহিমায়ও যথেষ্ট উজ্জ্বল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চৈতন্যের জীবন-কর্মকে তাঁরা দেখেছেন ; এই দেখার মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ জীবন-উপলব্ধি, জীবনচর্যা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মনোভঙ্গিও প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় সন্ধ্যক্ষর শেখাতে ছড়ার মত যে কবিতাটি লিখেছেন, তাতে চৈতন্য তো' আছেনই সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকপরায়ণ খেয়ালী দ্বিজেন্দ্রনাথকেও পাই। কে জানত ডিফ্‌থং শেখাতেও চৈতন্যের প্রয়োজন ! কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রবাসীপুত্রের মঙ্গল কামনায় চৈতন্যচরিত 'অমৃতাভ' রচনা করেছেন, নিমাইয়ের উপনয়ন দৃশ্যের বর্ণনা সূত্রে নিজপুত্রের উপনয়ন-কথা বলে তাঁর স্নেহশীল পিতৃহৃদয়কে অনাবৃত করেছেন ; আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে রচিত এই কাব্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা'র সঙ্গে 'হরিবোল' মিলিয়ে সরল আবেগের পথে জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবি জীবনানন্দের অনেক আগেই 'বাংলার মুখ' দেখে চরিতার্থ হয়েছিলেন, তিনি চৈতন্যকে দেখেছেন বাংলার বিশিষ্ট প্রাণধর্মের দিক থেকে। অগ্নিযুগের অরবিন্দ রাজনৈতিক নেতারূপে স্বরাজের জন্য দাবী করেছেন ঈপ্সিত বস্তুলাভে চৈতন্যের সমান আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ; যোগী-অরবিন্দ অতিমানসের দিক থেকে চৈতন্যের অধ্যাত্ম সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার চৈতন্য মহিমাকে দেখেছেন ভক্তিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন কীর্তন ও সাকার উপাসনার পটভূমিতে।

এই বিচিত্রতাই এ সঙ্কলনের গৌরব। বিচিত্র স্বাদের রচনাগুলিকে আমরা জীবনবৃত্ত, ধর্ম, সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি—এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি। এগুলির মধ্যে কেবল ভক্তিই নেই, আছে যুগানুগ বিচার-বিশ্লেষণও। চৈতন্য ধর্ম নিয়ে কলকাতার Y.M.C.A.-র কেনেডি সাহেব কিছু কটূ মন্তব্য করে-ছিলেন ; তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সতীশ-চন্দ্র দে। উড়িষ্যার রাজনৈতিক পতনের জন্য চৈতন্যকে দায়ী করেছিলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উড়িষ্যার পণ্ডিতদের একাংশ এখনও এই ধারণা পোষণ করে চলেছেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে রাখালদাসের মত খণ্ডন করেছেন।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত রচনাগুলির অধিকাংশই মূলের সংক্ষিপ্ত রূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন উক্তি বা বিবৃতিকে একসূত্রে গেঁথে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। স্বল্প পরিসরে উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালী মনীষীদের চৈতন্যচর্চার একটা মোটামুটি পরিচয় লাভই এ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক।

উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালী মনীষীদের চৈতন্যচর্চা এবং চৈতন্যের বহুমুখী প্রতিভাকে কেন্দ্র করে তাঁদের বিচিত্র সিদ্ধান্ত আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই উক্ত মনীষীদের চৈতন্যবিষয়ক রচনার কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল।

জীবনবৃত্ত

গৌরলীলা

লালন ফকীর (১৭৭৫-১৮৯১ খ্রীঃ)

॥ ১ ॥

তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে।
তিন পাগলে হ'লো মেলা নদেয় এসে॥
একটা পাগলামো করে, কোল দেয় জাত অজাতেরে দৌড়িয়ে যেয়ে।
ও তার নাই জেতের রোগ, এমন পাগল কে দেখেছে॥
একটা নারকোলের মালা তাতে জল তোলা ফেলা করঙ্গ সে।
আবার হরি ব'লে পড়ে ঢলে ধূলার মাঝে॥
দেখতে যে যাবি পাগল সেই তো হবি পাগল বুঝবি শেষে।
ছেড়ে তারো ঘর-দুয়ার ফিরবি নে যে॥
পাগলের নামটি এমন বলিতে অধীন লালন হয় তরাসে।
চৈতে নিতে অদ্বৈ পাগল নাম ধরেছে॥

॥ ২ ॥

যদি গৌরচাঁদকে পাই, গেল গেল এ ছার কুল আর তাতে ক্ষতি নাই।
জন্মিলে মরিতে হবে কুল কি কারো সঙ্গে যাবে।
মিছে কেবল দুদিন ভবে করি কুলের বড়াই॥
কি ছার কুলের গৌরব করি অকূলের কূল গৌর হরি।
ভব-তরঙ্গের তরী গৌর গোঁসাই॥
ছিলাম কুলেব কুলবালা স্কন্ধে নিলাম আঁচলা ঝোলা।
লালন বলে, গৌর-বালা আর কারে ডরাই॥

ভারত-তপন শ্রীগৌরাঙ্গ

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)

পরম পবিত্র আত্মা ভারত-তপন,
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোনার বরণ।
জগতে মহৎকাজ সাধিবে যে জন,
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন—
বিচারিয়ে মনে মনে পঠৎ দশায়,
দেন প্রভু বিসর্জন আহ্নিক পূজায় ;
শুনি তাই গুরু রাগে বলিল বচন,
'সন্ধ্যা পূজা পরিহার কর কি কারণ' ?
উত্তর দিলেন দান নব অবতার,
'বাহ্যিক পূজায় মম নাহি অধিকার ;
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়,
মৃতাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয়'।

দেবতা-সমান তিনি লোকাতীত মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী।
বিনীত স্বভাব শান্ত, ধর্ম পরায়ণ,
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশূন্য, সত্য আরাধন,
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর দ্বিজ উপাসনা।
ধর্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক,
শক্তি হেরে ভক্তিভাবে ব্রহ্ম বলে লোক।

প্রচারিতে প্রিয় ধর্ম সত্য সনাতন,
বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন ;
কাঁদিলেন শচীমাতা, গেল আঁখিতারা,
পাগলিনী পুত্রশোকে চক্ষে শতধারা।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ঘরণী
হাহাকার করি কাঁদে লুটায়ে ধরণী।
বিদরে হৃদয় মরি এ কি সর্ব্বনাশ !

সোনার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস,
এটি কি ধর্মের কর্ম সর্বগুণাধার,
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার।
পতিপত্নী এক অঙ্গ সাধুর বচন,
তবে কেন দুঃখিনীরে প্রিয় দরশন
না লয়ে আদরে সনে সধর্মিণী ব'লে,
অবহেলে সঁপে গেলে মহাশোকানলে' ?

সাধারণ নরসম প্রভু মহোদয়
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমপাশে আবদ্ধ হৃদয়,
জগতের হিত যেই হৃদে পেল স্থান,
পটাস্ করিয়ে পাশ ছিঁড়ি খান খান।

আকর : সুরধুনী কাব্য (১৮৭১ খ্রীঃ) সপ্তম সর্গ।

আউলে-গোঁসাই

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

আউলে গোঁসাই গউর চাঁদ
ভাসাইল দেশ টুটিয়া বাঁধ।
দুই ভাই মিলি আসিছে অই
কি মাধুরী আহা কেমনে কই॥

পাষাণ হৃদয় করিয়া জয়
আধা-আধি করি বাঁটিয়া লয়
শ ও শ হাজার দোধারি লোক
দোঁহারে নেহারে ফেরে না চোক॥

কূল ধসানিয়া প্রেমের ঢেউ
দেখে নি এমন কোথাও কেউ।
এই নাচে গায় দু'হাত তুলি
এই কাঁদে এই লুটায ধূলি॥

আকর : 'বড়বা' : সৈয়দ মুজতবা আলি

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ধর্মের ত্রিবেণী—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিধারা—মানবজীবনের প্রভাত হইতে ধীরে ধীরে পুণ্যশ্লোক জগদ্‌গুরু ঋষিদিগের মুখে প্রবাহিত হইতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বরিক সম্পদে পঞ্চসহস্র বর্ষ পূর্বে সেই জ্ঞানের সরস্বতী, ভক্তির যমুনা ও কর্মের ভাগীরথী সংস্কৃত ও সম্মিলিত করিয়া ভারতীয় বা জাগতীয় কর্মের মহাপ্রয়াগ তীর্থে নবধর্ম স্থাপন করিয়া যান। কালে সেই ভাগীরথী পঙ্কিল হইয়া উঠিলে, শ্রীবুদ্ধদেব সার্দ্ধ দুইসহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহার কর্মধারার এবং শিবাবতার শ্রী শঙ্করাচার্য্য অনুমান ১২০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জ্ঞানধারার সংস্কার ও বিস্তার সাধন করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কর্মবাদে এবং শঙ্করাচার্য্যের সোহহংবাদে ভক্তিধারা বিলুপ্ত প্রায় হয়। অনুমান ৯০০ বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ এবং তাঁহার বার্দ্ধক্য সময়ে মধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত জ্ঞান ও ধর্মমূলক ভক্তিধর্ম পুনর্জীবিত করেন। মধ্বাচার্য্যের পঞ্চদশতম প্রধান শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্যটন করিয়া এই ধর্ম প্রচার করেন। তিনিই নবদ্বীপের শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যকে এই ধর্মে দীক্ষিত ও একটি ভক্তিসভা স্থাপিত করিয়া নবদ্বীপে শুষ্ক ন্যায়শাস্ত্রের মরুভূমিতে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত করেন। এই দীক্ষা হইতে কমলাক্ষ অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হন। ভক্তেরা প্রাতে সন্ধ্যায় সম্মিলিত হইয়া তালি দিয়া নাম কীর্তন করিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁদের উপর শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতেন। বিদ্বেষ-বিদ্ধ অদ্বৈত প্রমুখ 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন। তিনি সেই কাতর-আবাহন শ্রবণ করিয়া ৪০০ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে অমৃতাভ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-ভাগীরথীর প্রবল বন্যায় এই বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন।[১]

তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধু তীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানাস্থান কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুতে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দ যশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম-সুদামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপকিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস,—সর্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ষড় রসভোগের অভিনয় দেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না।[২]

আকর : ১. 'অমৃতাভ' কাব্যের ভূমিকা
২. 'ভানুমতী' উপন্যাস

অমৃতাভ

নবীনচন্দ্র সেন

বৈকুণ্ঠ

আবাহন
"গোপীমোহন ! রাজরাজেশ্বরী
রাধিকারঞ্জন ! আয় রে আয় !"—
কি মধুর গীত ! কিবা মধুরা যামিনী
শত পূর্ণ চন্দ্রোজ্জ্বলা সুধা-সঞ্চারিণী
হাসিছে ত্রিদিব কুঞ্জে ; ত্রিদিব সমীরে,
অমৃত-বাহিনী চারু তটিনীর তীরে।
একবার ব্রজাঙ্গনা করিতেছে গান,
তুলি করলীলা-পদ্ম ; প্রেমমুগ্ধ প্রাণ,
বৈকুণ্ঠ-বীণার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া,
আভরণ রণ-রণে নাচিয়া নাচিয়া।
আবার রাখালগণ গায় আত্মহারা—
নাচে তালে তালে, হৃদে কি অমৃত-ধারা !
শাখায় শাখায় প্রেমে গায় পাখীগণ,
ময়ুর ময়ূরী নাচে তুলিয়া পেখম।
নিরমল জ্যোৎস্নায়, ফুল্ল ফুলরাশি
নাচিছে হাসিছে প্রেমে কি মধুর হাসি !·

প্রেমে গদগদ কণ্ঠে কহিলেন হরি—
মা ! মা ! পিতঃ ! প্রাণসখা ! প্রাণ সহচরি !
কি কুণ্ঠা বৈকুণ্ঠে প্রাণে হইল সঞ্চার ?
কেন প্রেম আবাহন কাতরে আমার ?···

জানু পাতি পদাম্বুজ করিয়া গ্রহণ
প্রেম বক্ষে, গলদশ্রু যুগল নয়ন,
কহিলা কিশোরী প্রেম উচ্ছ্বসিত প্রাণে—
"চেয়ে দেখ প্রাণনাথ ! পৃথিবীর পানে।
দেখ ভারতের পানে।·· তব লীলাভূমি।
ধর্মের উদয়ভূমি ! সেইখানে তুমি
যুগে যুগে নরজন্ম করিয়া গ্রহণ
দেখাইলা নরচক্ষে নর-নারায়ণ।··

শুন পুণ্য হাহাকার, পাপ অট্টহাসি ;
প্রেম শুষ্ক, প্রজ্জলিত হিংসা-বহ্নিরাশি ;
ধর্মের পতন, অধর্মের অভ্যুত্থান ;—
পূর্ণ কাল ! কর নাথ ! জীব পরিত্রাণ ।"

তুষিয়া করুণাময়ী পরম আদরে
কহিলেন নারায়ণ গদগদ স্বরে—
"প্রেমময়ি ! আরাধিকা রাধিকা আমার !
কাঁদে প্রাণ যুগে যুগে এরূপে তোমার
মানবের মহাদুঃখে । করুণা উচ্ছ্রিত
নব ধর্ম ভাগীরথী হয় প্রবাহিত
যুগে যুগে ; করুণার এই আকর্ষণে
লভি জন্ম যুগে যুগে, তব আবাহনে ।

অবতরি এইবার জাহ্নবীর তীরে,
ভাসাইব ধরাতল প্রেম-অশ্রু-নীরে ।
দ্বাপরেতে অনুরাগী, বৈরাগী এবার ;
রমণী পাবেনা ছায়া ছুঁইতে আমার ।
বাঁশী ছাড়ি নিব দণ্ড কমণ্ডলু আর ;
দ্বাপরে ঐশ্বর্য-লীলা, দরিদ্র এবার !
মম আত্মা তব অঙ্গ করিয়া গ্রহণ
দেখাইব, প্রিয়তমে ! যুগল মিলন ।
একাধারে ব্রজপ্রেম করি অভিনয় ;
দেখাইব ব্রজলীলা কামক্রীড়া নয় ।...
তোমরা লভিবে জন্ম যথারুচি যার ;
হরে কৃষ্ণ—এইবার গৌর অবতার ।

প্রথম সর্গ

অবতরণ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা সুশীতল ছাইয়া জাহ্নবীরে ;
শোভে নবদ্বীপে, শান্তি স্বরূপিনী, ছাইয়া জাহ্নবীতীরে ।...
শিমূলে পলাশে প্রকৃতি শ্যামাঙ্গে আবির-কুঙ্কুম মাখি,
গাইয়া কোকিলে, নাচিয়া অনিলে, মুদিছে মৃদুল আঁখি ।

"হরিবোল হরি !"—বাজিল মৃদঙ্গ কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ তীরে ;
বাজিল আরতি দোল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, দেবালয়ে, সৌধ শিরে ।
"হরিবোল হরি" !—নরনারী শিশু আনন্দে অধীর গায়,
"হরিবোল হরি !"—প্লাবিয়া ধরণী গগনে বহিয়া যায় ।
"হরিবোল হরি" !—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র গাইছে বিপন্ন স্বরে,
"হরিবোল হরি !"—অসংখ্য নক্ষত্র গাইছে ভকতি ভরে ।
"হরিবোল হরি" !—আচার্য্য অদ্বৈত গায় প্রেমে মাতোয়ারা—
"এস এস নাথ !—জুড়াও জগত ঢালিয়া প্রেমের ধারা ।"···

দ্বিতীয় সর্গ

শৈশবলীলা

গ্রহণান্তে ধীরে পূর্ণচন্দ্র ভাসে বসন্তের নীল নির্মল আকাশে ।
প্রসবান্তে নর-অদৃষ্ট-আকাশে কি অমিয় হাসি শিশুচন্দ্র হাসে ।
করুণ-অরুণ কি নয়ন আভা, করুণ-অরুণ কোণায় হাসে !
চলচল ছলছল দুনয়নে শীতল তরুণ করুণা ভাসে ।···
নিম্ব বৃক্ষতলে সূতিকার ঘরে, জনমিল শিশু—শচীমাতা তাই,
বহু শিশু হারা কাতরা জননী, রাখিলেন নাম আদরে 'নিমাই' ।
হেন গৌরবর্ণ দেখে নাই কেহ, অঙ্গে কাঁচা সোনা গলিয়া বয় ;
বর্ণ নহে, স্বপ্ন স্বর্ণ চম্পকের, হলো "গৌর" নাম নবদ্বীপময় ।
বিনা হরিনাম না ঘুমায় শিশু, নাহি করে শিশু মাতৃস্তন পান,
দেয় হামাগুড়ি আনন্দে অধীর, যদি কেহ গায় সুমধুর নাম ।
গাও হরিনাম, সোনার পুতুলি আসিবে ছুটিয়া কোলেতে তোমার ;
শচীমার গৃহ হইল গোলোক, হরিনাম গান গৃহে অনিবার ।···
বড়ই অধীর চঞ্চল নিমাই, খেলে সারাদিন তীরে জাহ্নবীর ।
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা, নাহি রৌদ্র বৃষ্টি, থাকে সারাদিন খেলায় অধীর ।
কোন ব্রাহ্মণের শূন্য পুষ্প পাত্র ফেলিয়া নিমাই দিয়াছে ফুল,
কাহারো নৈবেদ্য করেছে ভক্ষণ, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে যমের ভুল !"
গালি দিতে দিতে ক্রুদ্ধা নরনারী ছুটেছে পশ্চাতে বিচিত্র দল,
ছুটেছে নিমাই নক্ষত্রের মত, শচীর অঙ্গনে উঠে কোলাহল ।···

কহে শচীমাতা কাতরে সকলে—"ক্ষেপা ছেলে, বাছা ! নাহি কিছু জ্ঞান ।
অবোধ শিশুরে ক্ষমা কর সবে, হইয়াছে অপদেব অধিষ্ঠান ।
হাঁরে ক্ষেপা ছেলে ! না যাইতে কোথা কত করি মানা, শুননা কিছু ;

আজি তোরে শিক্ষা দিব আমি দেখ!"—ছুটিলা জননী নিমাইর পিছু।
যেখানে উচ্ছিষ্ট হাঁড়িগুলা আছে, তথা সিংহাসন পাতিয়া নিমাই,
কহে, "কেন ওরা নাহি লয় নাম, জিজ্ঞাস! আমার কোন দোষ নাই।"
হাহাকার করি কহেন জননী—"নিমাই! নিমাই! কি করিলি বল্?
ব্রাহ্মণের ছেলে হইলি অশুচি, মারিব না, চল্ গঙ্গায় চল্"।
হাসি কহে শিশু—"তুই বলেছিস, অশুচিও শুচি হরিনামে হয়;
আমি হেথা বসি গাব হরিনাম, হাঁড়িগুলা শুচি হইবে নিশ্চয়।
আর যে ইহারা নাহি লয় নাম, ইহারা কি তবে অশুচি নয়?"
শিশুর বদন গম্ভীর এমন, নরনারী সবে মানিল বিস্ময়।

তৃতীয় সর্গ

বিশ্বরূপ

…শিশুর চাঞ্চল্য-লীলা ভাবি কিন্তু মনে, দেখিতেন বিশ্বরূপ কি যেন স্বপন!
ভাবিতেন,—"আসিছেন নন্দের নন্দন—কহেন অদ্বৈত সদা ঋষি মূর্তিমান্।
নিমাই কি তবে সেই নন্দের নন্দন? আমি কি তাহার সেই জ্যেষ্ঠ বলরাম?"
তখন সে বৃন্দাবন স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রায়, তখন সে ব্রজলীলা স্বপ্ন-স্মৃতিমত,
ভাসিয়া উঠিত মনে,—স্বচ্ছ মেঘচ্ছায়া শরতের,—স্মৃতিচ্ছায়া জন্মান্তর গত।
ভাবিতেন মনে মনে—"জীবনের ব্রত তবে দেখি অতিশয় দুরূহ আমার।
আমি জ্যেষ্ঠ, আমি তারে না দেখালে পথ, নিমাই কেমনে পথ পাইবে তাহার?
হইলা 'শঙ্করারণ্য পুরী' বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসরে করি সন্ন্যাস গ্রহণ;
বজ্রাহত জগন্নাথ, শচী অভাগিনী,—ব্যাপি সর্ব নবদ্বীপ উঠিল ক্রন্দন।

চতুর্থ সর্গ

উপনয়ন

চঞ্চল অস্থির শিশু, কিন্তু বিশ্বরূপে প্রাণের অধিক ভালবাসিত নিমাই,
নিমাই করিত ভয় পিতার অধিক; আজি শূন্যগৃহ, সেই বিশ্বরূপ নাই।…
শচীদেবী শোকে স্নেহে আকুলা অধীরা চুম্বিলেন পুত্র-মুখ আবার আবার;
চুম্বে যথা উষাদেবী কনক-কমল, চুম্বে পবিত্রতা যথা প্রেম সুকুমার।
কহিলেন শোকাকুলা…"না না, বাপধন। সন্ন্যাসী হইতে আমি দিবনা কখন
ফুটিল যে কটি ফুল এ দীনালতায়, একে একে নারায়ণ করিলা গ্রহণ
পদতলে পুষ্পপাত্রে। সেই পুষ্পপাত্রে করিয়াছে বিশ্বরূপ আত্মসমর্পণ।
সেইসব শূন্যবৃন্তে একই কুসুম নিমাই আমার, তুই মায়ের জীবন।

নিমাইরে ! অস্তগামী ছুটি জীবনের শেষ আলো, শেষ আশা বাছনি আমার ।
তুইরে নিশ্বাস শেষ ! হইলে অন্তর তুই, পিতামাতা তোর বাঁচিবে না আর ।”

নবম বৎসর ; উপনয়ন সময় ; হইল শচীর গৃহ উৎসব-পূরিত ।
সোনার পুতুল ; অঙ্গে বালার্ক-কিরণ ; করে দণ্ড, পৃষ্ঠে ঝুলি, মস্তক মুণ্ডিত ।
স্বর্ণ-পুতুলের অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ, আয়ত নয়নে কিবা দেবত্ব-আবেশ !
কি করুণা মুখে ! কিবা করুণা অসীম পড়িছে ঝরিয়া বাহি শ্রীঅঙ্গ নবীন !
সমবেত নিমন্ত্রিত পণ্ডিত-মণ্ডলী, আত্মীয় আত্মীয়া সমবেত নিমন্ত্রিত
হইল সজলনেত্র ; পিতা জগন্নাথ করিলা সজল-নেত্রে তনয়ে দীক্ষিত !
কহিলা প্রণব কর্ণে—প্রণব ! প্রণব ! শব্দ ব্রহ্ম ভারতের ! মহাশব্দ ওঁ ।
বেদ উপনিষদের গীত অদ্বিতীয় অমর, অক্ষয়, নিত্য । বিদারিয়া ব্যোম
গাইতেছে মহাবিশ্ব গীত অদ্বিতীয় বিঘূর্ণিত···বিঘূর্ণিত মহাশব্দ ওঁ !
ভারতের ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব আর, একশব্দে পরিণত—মহাশব্দ ওঁ ।
কহিলা—'স্বর্গ-পৃথিবী-আকাশ ব্যাপিয়া আছেন যিনি, আমাদের জ্ঞান
করেন প্রকাশ যিনি, সেই সবিতার বরণীয় আলোকের করি আমি ধ্যান' ।
কি শক্তি এ মহামন্ত্রে ! আকুল উচ্ছ্বাস থাকে গুপ্ত যথা মহা জলধির জলে ।
শ্রবণের পথে মন্ত্র প্রবেশি হৃদয়ে জাগাইল হৃদয়ে কি নিদ্রিত উচ্ছ্বাস !
নাচিতে লাগিল শিশু তুই বাহু তুলি, শিশু অঙ্গে স্বেদ কম্প পুলক প্রকাশ !
খুলিল জ্ঞানের নেত্র গায়ত্রী পরশে, খোলে দিবসের নেত্র পরশে উষার
নির্মল প্রভাতে যথা । তৃতীয় নয়ন লভিয়াছে ; পূর্ণ উপনয়ন তাহার !

* * *

গিয়াছেন বিশ্বরূপ । একি স্বপ্ন হায় ! দেখিলেন জগন্নাথ ।···যাইবে নিমাই ?
একি ভাব নিমায়ের ? নিমাই ! নিমাই ! বৃদ্ধ জগন্নাথের ত লক্ষ্য আর নাই ।
বসিয়া পূজায় বৃদ্ধ কহিল কাঁদিয়া···“হায় ! এই ইচ্ছা যদি তব, নারায়ণ !
নিয়াছ সকল ; ছিল যে ছুটি ফল, তাহাও কি এইরূপে করিবে হরণ ?···
জরে জরাজীর্ণ দেহ পড়িল ভাঙ্গিয়া জনকের ; উপস্থিত অন্তিম-সময় ।
গেছে ভ্রাতা ; যায় পিতা ; হইয়া আকুল পড়িল ভাঙ্গিয়া শিশু কোমল-হৃদয় ।
পিতার চরণতলে কহিল কাঁদিয়া পুত্র শোকাকুল···“বাবা ! শিশু নিরাশ্রয়
কারে সমর্পিয়া, যাও সমর্পিয়া কারে অভাগিনী মা আমার কোমল-হৃদয়” ?···
হরি ভক্ত জগন্নাথ কহিলেন ধীরে···“নিমাই ! তোমার হরি অনাথের নাথ ।
তোমাদের সমর্পিয়া চরণে তাঁহার চলিলাম, সে চরণে করি প্রণিপাত ।”
অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে মুদিলা নয়ন জনক, তারক ব্রহ্ম মুখে হরি নাম !
“হরিবোল ! হরিবোল !”···বলিয়া নিমাই নিমজ্জিত পিতৃপদে পড়িল—অজ্ঞান !

চঞ্চল পণ্ডিত

দ্বাদশ-বর্ষীয় শিশু আশ্রয় বিহীন। গিয়াছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বৃদ্ধ দীন
গেলেন অনন্ত-ধামে। মাতা বৃদ্ধা দীনা পুত্রশোকে পতিশোকে সন্তপ্তা মলিনা।
হৃদয়েতে বিপ্লবের ছায়া ঘোরতর হইল পতিত; শিশু হইল কাতর।
সে চাঞ্চল্য, সেই ক্রীড়া হইল অন্তর। হইল হৃদয় স্থির শান্ত সরোবর।···
কর্ত্তব্যের গুরুচ্ছায়া হৃদয়-গগনে ভাসিল, গাম্ভীর্য্যচ্ছায়া ভাসিল বদনে।···
বর্ষসপ্ত এইরূপে করি অধ্যয়ন, হইলেন অধ্যাপক পণ্ডিত নিমাই;
আলোকিল বঙ্গ কীর্ত্তি-কৌমুদী তাঁহার।
নিমাই ও রঘুনাথ একদা উভয়ে হতেছেন গঙ্গাপার। কহে রঘুনাথ···
"ভাই বিশ্বম্ভর! হাতে কি গ্রন্থ তোমার?" "ন্যায়-গ্রন্থ-স্বরচিত"—শুনিয়া উত্তর
হইলেন রঘুনাথ মলিন-বদন। চাহিলে শুনিতে গ্রন্থ, লাগিলা পড়িতে
অনিচ্ছায় বিশ্বম্ভর। বিস্ময়ে নিমাই দেখিলা যতই গ্রন্থ করিছে শ্রবণ,
ততই শ্রোতার মুখ হতেছে মলিন। জিজ্ঞাসিলে হেতু তার; কহিলেন খেদে
রঘুনাথ—"বিশ্বম্ভর! বহু পরিশ্রমে করিয়াছি প্রণয়ন এক গ্রন্থ আমি।
কিন্তু ভাই! এই গ্রন্থ থাকিতে তোমার; আমার 'দীধিতি' কেহ পড়িবে না আর।
কে ছাড়ি জ্যোৎস্না চাহে আলো জোনাকির? চাহে কূপোদক ছাড়ি বারি জাহ্নবীর?
সে মুহূর্তে বিশ্বম্ভর গ্রন্থ আপনার করিলেন বিসর্জন গর্ভেতে গঙ্গার।
"কি করিলে! কি করিলে!"···কহি উচ্চৈঃস্বরে চাহিলেন রঘুনাথ করিতে উদ্ধার।
হইয়া নিষ্ফল যত্ন, স্তম্ভিত, বিস্মিত, রহিলেন রঘুনাথ যেন চিত্রার্পিত,
চাহি বিশ্বম্ভর পানে। হাসিয়া নিমাই কহিলেন—"বৃথা খেদ কর তুমি ভাই!
ভক্তিহীন ন্যায়শাস্ত্র মরুর সমান, ভক্তিগঙ্গা গর্ভে তার উপযুক্ত স্থান।"

মুকুন্দ সঞ্জয় অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে; চারু চণ্ডীমণ্ডপে তাহার
খুলিলেন চতুষ্পাঠী। দেখিতে দেখিতে বহু ছাত্রে চতুষ্পাঠী হইল পূরিত।
'নিমাই পণ্ডিত'—কীর্তি কণ্ঠে শত শত করিল প্রচার ক্রমে দিগ্ দিগন্তরে,
শচীর আনন্দ আর ধরেনা অন্তরে। পুত্র-কণ্ঠে সরস্বতী, আনিলেন ঘরে
নাম 'লক্ষ্মী' 'লক্ষ্মীবধূ' গৃহ আলো করি বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরমা সুন্দরী।
বহুদিন পরে বৃদ্ধা জননীর মুখে ভাসিল আনন্দ-হাসি, বহুদিন পরে
উথলিল সুখসিন্ধু জননীর বুকে। অধ্যয়নে অধ্যাপনে কাটাইয়া দিন,
অপরাহ্ণে করে পুনঃ নগর-ভ্রমণ,···গলায় ফুলের মালা, ললাটে চন্দন,
চন্দনে চিত্রিত বক্ষ, সুবর্ণ-দর্পণ। পরিধান পট্টবস্ত্র, হাসি ভরা মুখ,
হৃদয়ে তরঙ্গ ভঙ্গে খেলিছে কৌতুক। সে তরঙ্গ মুখে পড়ে পূর্ববঙ্গ যদি,
তবে তার লাঞ্ছনার না থাকে অবধি। বিশেষ বৈষ্ণব কেহ পড়িলে সম্মুখে,

বিষম আতঙ্ক ত্রাস উঠে তার বুকে।
একদা সায়াহ্নে বসি জাহ্নবীর তীরে—মধুর বাসন্তী সন্ধ্যা, ভাগীরথী নীরে
চালিয়াছে সচঞ্চল ছায়া সুশীতল, খেলিছে দক্ষিণানিলে হিল্লোল চঞ্চল।
গাইছে কোকিল ; গায় উড়িয়া আকাশে পাপিয়া মধুর কণ্ঠে ; বাসন্ত বাতাসে
ভাসিতেছে দয়েলের কণ্ঠ উতরোল। গাইছে পূরবী সান্ধ্য জাহ্নবী হিল্লোল।··
নিভৃতে বসিয়া এক বিটপি-তলায় নিমাই সশিষ্য সান্ধ্য শীতলচ্ছায়ায়।
শৈলজার সান্ধ্য শোভা করি নিরীক্ষণ করিছেন শাস্ত্রালাপ আনন্দিত-মন।
কাশ্মীরী কেশব দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, জিনিয়া ভারত নবদ্বীপে উপনীত।
ভ্রমিতে গঙ্গার তীরে দেখে আচম্বিত সশিষ্য নিমাই, চন্দ্র-নক্ষত্র-বেষ্টিত।···
ওকি রূপ! আকর্ষিছে আকুল হৃদয়, কেশব নিকটে গিয়া দিলা পরিচয়।
সসম্ভ্রম নিমাই করিয়া নমস্কার করিলেন অভ্যর্থনা। কহিলা কেশব—
"এখনো বালক তুমি ; কিন্তু নবদ্বীপে শুনিতেছি ব্যাকরণে তুমি অদ্বিতীয়
এ বয়সে, মানিতেছি মনেতে বিস্ময়।" বিনয়ের প্রতিমূর্তি কহিলা নিমাই
অধোমুখে মৃদুকণ্ঠে·· "জ্ঞানে ও বয়সে সত্যই বালক আমি" চাহি গঙ্গাপানে—
"বড় সাধ মনে শুনি মহিমা গঙ্গার ভারত বিজয়ী মহা পণ্ডিতের মুখে।"
শুক্লপক্ষ ; শশধর হাসিছে আকাশে ; জ্যোৎস্না জাহ্নবী-বক্ষে কি লীলা প্রকাশে!
কেশব কবিত্ব পূর্ণ ভাষায় সুন্দর রচিল গঙ্গার স্তব। ঝটিকার বেগে,
কবিত্বে পাণ্ডিত্যে করি বিস্মিত সকল। কহিলা নিমাই ধীরে—"জগতে দুর্লভ
এ কবিত্ব, অমানুষী শক্তি আপনার। বিনীত বাসনা মনে করিয়া শ্রবণ
দোষগুণ কবিতার, করিব গ্রহণ কবিতার রসসুধা লীলা কল্পনার।"
"দোষ!" জতুগৃহমত উঠিল জ্বলিয়া দিগ্বিজয়ী অভিমানে। কহিলা সক্রোধে···
"ব্যাকরণে, শিশুশাস্ত্র পড়িয়াছ তুমি ; পড় নাই অলঙ্কার। কবিতার রস
কেমনে বুঝিবে তুমি! বধির কেমনে বুঝিবে সঙ্গীত সুধা? ইন্দ্রধনু-শোভা
দেখিবে জন্মান্ধ?" শুনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলা নিমাই—"পড়ি নাই অলঙ্কার ;
কিন্তু শুনিয়াছি আমি দেবী বীণাপাণি বিরাজেন নবদ্বীপে। কবিতার সুধা
ভাসে জাহ্নবীর স্রোতে, হাসে চন্দ্রকরে, মৃদু মন্দানিলে বহে, মর্মরে পাতায়,
তরুলতা নবদ্বীপে কবিতার রস পারে বুঝিবারে, পারে করিতে বিচার।"
অপূর্ব-প্রতিভা বলে, নিমাই তখন, দেখাইলা একে একে দোষ কবিতার।···
সারানিশি অনিদ্রায় সন্তপ্ত কেশব ভাবিলেন—"এ যুবা কে? পাণ্ডিত্য এমন,
এ নম্রতা, এ বিনয়, নহে মানুষের।·· কি বৈরাগ্য প্রাণারাম হইল সঞ্চার
কেশবের হৃদয়েতে। ঐশ্বর্য্য তাঁহার—হয়, হস্তী, বহুমূল্য বসন-ভূষণ
ছিল যাহা সঙ্গে সব করি বিতরণ, গেলেন চলিয়া, করি সন্ন্যাস গ্রহণ।
উঠিল নদীয়া-ব্যাপী ঘোর আন্দোলন।

পুণ্যবান্ পিতৃস্থান দেখিতে নিমাই গেলেন শ্রীহট্টে, পূর্ববঙ্গে পুণ্যবতী।

দেখিলেন পূর্ববঙ্গে শস্য-সুশ্যামলা অন্নপূর্ণা জগতের ; মহা রঙ্গভূমি
পদ্মা মেঘনার ; শ্যাম পর্বতমালার ; সম্মিলন ক্ষেত্র ব্রহ্মপুত্র-শৈলজার !
বিশাল-হৃদয়া পদ্মা দেখিলা নিমাই, দিগন্তব্যাপী মেঘনা, নীলাম্বুতে ভরা,
বাসন্ত আকাশ তলে ঈষৎ চঞ্চলা। উপরে সুনীলাকাশ ; নিম্নে লীলাময়
অনন্ত সলিল নীল। দেখিলা নিমাই নৃত্যশীল নীলমণি ; নূপুর-নিনাদ
সলিলে কল্লোল মৃদু ; ধায় পুরিত বেণুবর বসন্তের অনিল-নিস্বন।
যৌবন-চাঞ্চল্যে সুপ্ত ভক্তির অঙ্কুর উঠিল জাগিয়া ধীরে, জীবনে প্রথম ;
জাগিয়া উঠিল সুপ্ত কি পূর্ব স্বপন ! নিরখিল পূর্ববঙ্গ বিমোহিত প্রাণ—
একি রূপ অলৌকিক ! কাঞ্চনে রঞ্জিত সুদীর্ঘ ত্রিভঙ্গ তনু। কিবা দেব-মুখ,
কি ললাট দেবত্বের প্রভাত গগন ; আরক্ত, সজল, পদ্ম পলাশলোচন !
প্রথম যৌবনে কিবা পাণ্ডিত্যের শেষ, কণ্ঠে সরস্বতী বসে, মুখে কৃষ্ণ নাম।—
ভাব-গ্রাহী পূর্ববঙ্গ ভাবেতে বিভোর চিনিল এ নহে নর ; পড়িল লুটায়ে
পাদপদ্মে, কৃষ্ণ নামে উঠিল মাতিয়া। ··
ভাবগ্রাহী পূর্ববঙ্গ ; হৃদয় কোমল, পদ্মার বেগের মত আবেগ প্রবল।
জ্ঞান-শুষ্ক নবদ্বীপ ; পুলিনে পদ্মার করিলেন ভক্তি ধর্ম প্রথম প্রচার,
প্রথম যৌবনে গৌর নিজে আত্মহারা, বহিল প্রথম ভক্তি ভাগীরথী ধারা।
বহু অর্থ, বহু শিষ্য হইয়া নিমাই ফিরিলেন নবদ্বীপে, দেখিলেন গৃহ
নিরানন্দ, নিরানন্দ মায়ের বদন। তনয়ে লইয়া বুকে, চুম্বিয়া ললাট,
বরষিয়া আশীর্বাদ জাহ্নবী-ধারায়, কহিলা কাঁদিয়া মাতা—"নিমাই ! নিমাই !
আমার সে লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীবধূ নাই। কালসর্পে না খাইয়া দুঃখিনী আমায়,
খাইল আমার সেই স্বর্ণ-প্রতিমায় ?·· কাঁদিয়াছে নবদ্বীপ করুণায় তার।
নিমাই ! গৃহের আলো নিবেছে আমার।" বড় কাঁদিলেন শচী, কাঁদিয়া নিমাই
কহিলা—"নিয়তি, মাতঃ ! কারো সাধ্য নাই লঙ্ঘিবে জগতে, শোক কর পরিহার !
তোমার গৃহের দীপ ইচ্ছায় আপন জ্বলিতে নিবিতে, মাগো, পারে কি কখন ?
জ্বালাও নিবাও তুমি কার্য্যে আপনার ; আমরা তেমনি দীপ বিশ্ব নিয়ন্তার।
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা যেই পুণ্যবতী পায়, তার মত কেহ নাহি ভাগ্যবতী।"

আসিল্যা ঈশ্বরপুরী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, পূর্বাশ্রম কুমারহট্ট, মূর্তি প্রেম-রাশি।
গুরু মাধবেন্দ্র পুরী, করি পরিহার জ্ঞান মার্গ, ভক্তিমার্গে "আদি সূত্রধার"
গুরুর 'গোপাল' মন্ত্রে দীক্ষিত ঈশ্বর মুখে কৃষ্ণনাম, চিত্তে কৃষ্ণ নিরন্তর।··
পুরীর রচিত কাব্য "কৃষ্ণ লীলামৃত" পড়িয়া শুনায় পুরী ভক্তি-উদ্বেলিত।
কহিলা—"পণ্ডিত ! যদি থাকে কোন দোষ, কহ দয়া করি, পাব পরম সন্তোষ।"
"ভক্তবাক্য, কৃষ্ণলীলা"···কহিলা নিমাই, "তারে দিবে দোষ, পাপী ধরাতলে নাই !
ভক্তের কবিত্ব প্রভু ! হউক যেমন, তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি হয় সর্বক্ষণ।
মূর্খ বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে'—যে বিদ্বান্, ভাবগ্রাহী কৃষ্ণ প্রীত উভয়ে সমান।"

কি আশার কথা ! কিবা সান্ত্বনা আমার, হৃদয়ে কি শক্তি, শান্তি, হইল সঞ্চার !
আমারো কবিত্ব নাই, নাহি ভক্তি আর, অমৃতাভ ! প্রেমলীলা চিত্রিতে তোমার।
দূর নির্বাসনে নাথ ! একই সন্তান, তাহার মঙ্গল তরে গাই এই গান।
অপ্রেমিক অকবির অযোগ্য সঙ্গীত, ভাবগ্রাহী ভগবান্ ! আজি আশান্বিত,—
হবে তুমি প্রীত তাহে—ভকত বৎসল ! নির্বাসিত নির্মলের করিবে মঙ্গল !

ষষ্ঠ সর্গ

পূর্বরাগ

বিজলী-প্রতিমা, অঙ্গ ঝলমল বালার্ক-কিরণে তীরে জাহ্নবীর,
সুন্দরী বালিকা, দুইটি নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত উজ্জ্বল স্থির।
প্রীতি-ছল-ছল, নয়নের তারা নীলাব্জ যুগল সলিলে ভাসি,
সুনাসা, সুভুরু, সুগোল বদন, অধরে ঈষৎ সলজ্জ হাসি।
যেন সংসারের সহস্র দাহনে লুকাবেনা সেই ঈষৎ হাসি।
যতই পীড়িবে পুষ্পাসব যেন হৃদয়ের সুধা উঠিবে ভাসি।
'বিষ্ণুপ্রিয়া'—আহা কি মধুর নাম, পিতা সনাতন রাজার পণ্ডিত,
'বিষ্ণুপ্রিয়া'—লক্ষ্মী, আবার কি লক্ষ্মী বধূরূপে গৃহে হবে অধিষ্ঠিত ?
নাইতে নাইতে, ভাবিতেন শচী ; ভাবিতেন ঘাটে আহ্নিক সময়ে,
বালিকার মুখ চাহিয়া চাহিয়া, মাতৃ স্নেহপূর্ণ উদ্বেল হৃদয়ে।
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধূরূপে আসিলেন গৃহে, আনন্দ অপার।
নির্বাপিত সেই আনন্দের দীপ শচীর কুটীরে জ্বলিল আবার।

নিমাই ভাবেন পূর্ববঙ্গ ভাব, ঈশ্বরপুরীর ভাব সুমধুর।
জানেন গিয়াছে গয়াতীর্থে পুরী ; চলিলেন গয়াতীর্থে বিশ্বম্ভর
পিতৃকার্য্য তরে কহিয়া মায়েরে ; হইলেন শচী কাতর অন্তর।
'বিষ্ণুপদ' চক্ষে দেখিলা নিমাই ; দেখিলা, পলক পড়িল না আর,
স্থির দু'নয়ন ; মুখে কি পুলক, বহে নেত্রে ফল্গুধারা অনিবার।···
পড়িছে নিমাই অবশ অধীর, ধরিলা ঈশ্বরপুরী আচম্বিত।
লভিয়া চেতন, পড়িল চরণে পুরীর—স্বর্বর্ণ মূর্তি ভূপতিত।
কহিলা কাঁদিয়া···"গয়াযাত্রা মম হইল সফল, সফল জনম।
আজি হইলাম শ্রীকৃষ্ণের দাস, দেখিলাম আজি কৃষ্ণের চরণ।···
তুমি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমারে দেও দীক্ষা, দেও শিক্ষা কৃষ্ণ-নাম ;
যেন কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে, করি আমি কৃষ্ণ প্রেম সুধাপান।"
কহিলেন পুরী—"পণ্ডিত ! পণ্ডিত ! যে দিন তোমারে দেখি নদীয়ায়,

সেই দিন চিত্ত জুড়াল আমার, সেইদিন আমি চিনেছি তোমায়।"
মন্ত্র 'গোপীজন বল্লভ' মধুর দিয়া কর্ণে, প্রেমে দিলা আলিঙ্গন;
উভয়ের প্রেমে উভয়ে অধীর; উভয়ের নেত্রে প্রেম-প্রস্রবণ।...
সেদিন হইতে পূর্বরাগ বেগে ছুটিল ভারত করিতে উদ্ধার;
সেদিন হইতে ঐরাবৎমত ছুটিল ভাসিয়া নিমাই আর।...
কষ্টে সঙ্গিগণ মিলি নদীয়ায় আনিল, সমস্ত পথেতে অধীর।
দেখে নবদ্বীপ। শ্রীমান্ শ্রীবাস, দেখেন মুরারি নয়ন স্থির—
একি রূপান্তর। সে চাঞ্চল্য নাই; নাহি সে বিদ্রূপ; কি বিনয় মুখে।
মলিন অধরে কি ঈষৎ হাসি! কি যেন কিভাব উথলিছে বুকে!
মুখে নাহি কথা, সদা অন্যমনা; কি কহিতে চাহে কি কথা কহে;
কি যেন কি ভাবে, কি যেন দেখে, সলজ্জ আনত বদনে রহে।
যেন কিশোরীর হৃদয়ে চঞ্চল নব অনুরাগ হয়েছে সঞ্চার;
ঘুমন্ত সাগর-সলিলে সুনীল ভাসিয়াছে যেন চন্দ্র দ্বিতীয়ার।

গভীরা রজনী, বসিয়া শয্যায় অঝোর নয়নে কাঁদেন নিমাই।
ফুটন্ত কলিকা বালা বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়ায়ে কোণায়, নেত্রে নিদ্রা নাই।
বসি অধোমুখে নখাগ্রে শয্যায় আঁকেন কি যেন অশ্রুতে যতনে;
ঈষৎ হাসিয়া—রৌদ্র বরিষায়-কহেন কি কথা অস্ফুট বচনে।
কেন এ রোদন? করেছে কি বালা কোন অপরাধ চরণে তাঁর?
বৃন্তচ্যুত পুষ্প কলিকার মত, পড়িল চরণে ধরি পা দুখানি।
ত্রস্তে মুছি ছবি, তুলি বালিকায় কহে—'ক্ষমা কর ললিতে! আমায়;
কদমতলায় সেই শ্যামরূপ দেখিয়াছি শুধু নয়ন-কোণায়।
শুধু তব মুখে সেই শ্যামনাম শুনেছি যমুনা তটে একবার;
কানের ভিতর দিয়া সেই নাম পশিয়াছে প্রাণে, সজনি! আমার।
শুধু নামে যার, বিনা দরশনে, ঢালিয়াছে প্রাণে এ সুধা আমার;
কহ, সখি! কহ, কহ দয়া করি, কেমনে পাইব চরণ তাঁর?"
একি কথা হায়! একি কাতরতা! কিছুই বালিকা বুঝিতে না পারে
নয়ন মুছিয়া ধীরে ধীরে গিয়া করিল আঘাত শচীমার দ্বারে।
"উঠ মা! উঠ মা!" ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া, ব্যাকুল জননী খুলিলা দ্বার।
চরণে পড়িয়া কহিল বালিকা "যাও মা! ও ঘরে যাও একবার।"
পাগলিনী মত ছুটিলেন মাতা, পশি শয্যাগৃহে রহিলা চাহি।
সেইরূপ বসি কাঁদিছে নিমাই, কি যেন আঁকিছে—বাহ্যজ্ঞান নাহি।
মায়ে একবার, মায়ে দুইবার, অধীরা জননী ডাকে বহুবার।
বুকে নিয়ে কহে—"নিমাই! নিমাই! কেন কাঁদ বাপ কি দুঃখ তোমার?"
লভিয়ে চেতনা, সংবরি আবেগ, কহিলা নিমাই,—"দেখেছি স্বপনে,

মাগো ! কি সুন্দর নবীন কিশোর, গলে বনমালা, বাঁশরী বদনে।
কিবা নীলিমার মহিমা শ্রীঅঙ্গে, কি সুন্দর চূড়া চিকুরে হেলে !
কিবা পীতাম্বর শোভিছে সুন্দর, নবঘনে কিবা বিজলী খেলে !
দেখিয়া সেরূপ এ আনন্দ ধারা বহিতেছে—কেন, কিছুই না জানি।
দেখিতে তাহাকে আকুল পরাণ ; কহ মা ! কেমনে দেখিব আমি ?”
কহিতে কহিতে আবেগে আবার পড়িয়া মূর্ছিত মায়ের বুকে ;
আছে শচীমাতা, আছে বিষ্ণুপ্রিয়া, চাহি অশ্রুমুখী, কথা নাহি মুখে।

* * *

উঠিয়া প্রত্যুষে করি গঙ্গাস্নান বসিলা নিমাই পরদিন টোলে,
ছাত্রগণ তাঁর আনন্দিত মনে হরি হরি বলি গ্রন্থ-ডোর খোলে।
যেই হরিনাম পশিল শ্রবণে, পশিল মরমে, পুলকিত প্রাণ।
হইয়া আবিষ্ট কহিলা নিমাই—“ছাত্রগণ ! আহা কি মধুর নাম।
করুন মঙ্গল কৃষ্ণ তোমাদের, এ বিদ্যাশিক্ষার কিবা প্রয়োজন ?
সকল বিদ্যার সার কৃষ্ণনাম, জীবনের লক্ষ্য তাঁহার চরণ।”…
ছিল যেই শিষ্য সম্মুখে তাঁহার ; লয়ে তারে বুকে করুণ প্রাণ
কহিলেন—“গাও ! গাও বৎস গাও, জুড়াইয়া প্রাণ গাও কৃষ্ণনাম !”
“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায়যাদবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।”
হাততালি দিয়া গাইছেন গুরু, হাততালি দিয়া গায় শিষ্যগণ,
জুড়াতে তাপিত, উঠিল প্রথম নবদ্বীপে শুভ শ্রীনাম কীর্তন।…

সপ্তম সর্গ

মহাপ্রকাশ

এইরূপে বিষ্ণুপদে কৃষ্ণ-প্রেম ভাগীরথী গয়ায় জন্মিয়া সুরধুনী,
ভেদি শাস্ত্র-হিমাচল, ছয় শৃঙ্গ দর্শনের ; প্রক্ষালিয়া পতিত পাবনী,
ছুটেছিল সিন্ধুমুখে, সংকীর্তন কলকলে হরিনাম ঘোষে ‘হরিদ্বার’ ;
পুণ্ডরীক প্রেমধারা ভোগবতী—‘ভোগবতী’ বহি হৃদে পুণ্য উপহার।
মিলিল তাহাতে ক্রমে নিত্যানন্দ প্রেমধারা, নিরমল ধারা যমুনার ;
হরিদাস প্রেমধারা, দীনা শীর্ণা সরস্বতী ;—করি প্রেম-ত্রিবেণী-সঞ্চার
উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নবদ্বীপে প্রেমগঙ্গা ছুটিলেন উচ্ছ্বাসে বন্যার ;
সাগরের তীরবাসী পতিত সগর বংশ ভস্মীভূত করিতে উদ্ধার।
শ্রীরামের আঙ্গিনায় উঠিল কীর্তনধ্বনি, উঠিল শচীর আঙ্গিনায়
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসভরা টলমল নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রেমের বন্যায়।
নিমায়ের দুইভাব ভক্ত ভগবান ভাব, ফুটিয়া উঠিছে দিন দিন,

কভু ভগবান্ ভাব, ঐশ্বর্য্য-পূর্ণিত দেহ, ভক্তভাব কভু দীনহীন।· ·
ক্রমে ভগবান্ ভাব বাড়িতেছে দিন দিন, ভাবাবিষ্ট প্রহর প্রহর
থাকেন নিমাই কভু, রহিলা প্রহর সপ্ত একদিন শ্রীবাসের ঘর।
সংকীর্তনে ভাবাবেশে রসিয়া বিষ্ণুর খাটে কহিলেন "কর অভিষেক।"
দেখিলেন ভক্তগণ, ঝলসিছে গৌরদেহে কি উজ্জ্বল দিব্যালোক এক;
নাই ভক্তভাব আর ঐশ্বরিক মহাভাবে ভাবাবিষ্ট যোগস্থ নিমাই;
নাহি সেই নর-দেহ, নাহি সেই নরভাব, নিমাই—নিমাই আর নাই।
জ্যৈষ্ঠের পূর্বাহ্ণ-প্রভা-পরাভবি কিবা জ্যোতি: করিয়াছে গৃহ আলোকিত।
কি জ্যোতিঃ নয়নে ভাসে! কি জ্যোতি বদনে হাসে, কিবা জ্যোতিঃ অঙ্গেতরঙ্গিত!
ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ আনি সুরধুনী-বারি, পড়ি মন্ত্র করিলা সেচন,
মুকুন্দ আনন্দে গায় অভিষেক সুমঙ্গল, হুলুধ্বনি করে নারীগণ।
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পহার, ললাটে চন্দন-চিত্র, সর্ব অঙ্গে চিত্রিত চন্দন।
নিতাই ধরিলা ছত্র, করিছেন নরহরি ভক্তিভরে চামর ব্যজন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া গন্ধ পুষ্প ধূপ প্রদীপ নৈবেদ্য উপচার,
পূজিলেন ভক্তগণ—বহে প্রেমনদী নেত্রে, বহে হৃদে প্রেম পারাবার।
প্রেমে আত্মহারা সবে, সবার বিশ্বাস দৃঢ়, সম্মুখে বসিয়া ভগবান্।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ পডি নাহি বাহ্যজ্ঞান।
প্রভু পুনঃ পুনঃ ·"চাহ বর, চাহ বর!" শ্রীধর কহিল "দেও বর।
যে ব্রাহ্মণ নিল কাড়ি আমার খোলার অন্ন, করিল কোন্দল নিরন্তর,
জন্মে জন্মে সে ব্রাহ্মণ হবে মম প্রাণনাথ; জন্মে জন্মে পাদপদ্ম তার
হবে শ্রীধরের প্রভু।" শ্রীধরের বক্ষ বাহি বহিতেছে ধারা বরিষার।·
মুরারি কাঁদিয়া কহে · "নাহি চাহি অন্যবর। কর প্রভু! এই বর দান,
জন্মে জন্মে মুরারির তুমি প্রভু, আমি দাস, গাই যেন তব গুণ-গান।
যেখানে যেভাবে জন্ম হউক আমার, প্রভু! তব স্মৃতি থাকে যেন মনে,
জন্মে জন্মে তব দাস, হইবে যাহারা যথা, থাকি যেন তাহাদের সনে।"
মুরারি শ্রীধর কাঁদে পড়িয়া চরণতলে, প্রভু কহে—"এস হরিদাস,
এস বক্ষে! এই দেহ হতে প্রিয় তব দেহ, এস! পূর্ণ কর অভিলাষ!
পাইয়াছ বড় দুঃখ, পাপিষ্ঠ যবনগণ বেত্রাঘাত করিল যখন,
আবরিয়া ভক্তদেহ রহিলাম, বেত্র লেখা এই অঙ্গে কর দরশন।"
দেখিলেন হরিদাস শ্রীঅঙ্গ বিক্ষত-ক্ষত, ঝরিতেছে রক্ত দরদর।
কাঁদি উচ্চে হরিদাস পড়িলা ধরণীতলে, শ্বাসশূন্য স্থূল কলেবর।
মুকুন্দ বাহিরে বসি কাঁদিতেছে অবিরল, কহিলেন শ্রীবাস কাতরে
"সকলে পাইল কৃপা, মুকুন্দ তোমার প্রিয়, কাঁদিতেছে তব কৃপা তরে"।
প্রভু কহে—"হেন কথা আনিও না মুখে কেহ, কেহ নাহি কহিও আমারে।
চেন নাই মুকুন্দেরে, ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, চাটগেয়ে ক্ষণে লাঠি মারে।"···

মুকুন্দ ভাবিল মনে প্রভু জানিয়াছে সব, গুরু অপরাধী আমি হায়।
না পারি করিতে আমি ভক্তিযোগে চিত্ত স্থির, এই দেহ ত্যজিব গঙ্গায়।
কাঁদিয়া শ্রীবাসে কহে—"জিজ্ঞাস প্রভুকে আমি কখনো কি পাব দেখা তাঁর ?"
ক্রোধে গরজিয়া প্রভু কহিলেন—"পাবে দেখা যদি কোটি জন্ম হয় আর"।
"পাইব-পাইব"—বলি মুকুন্দ দুবাহু তুলি নাচিতেছে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে হাসি হাসি—"আন মুকুন্দেরে কাছে," আনে ধরে পার্শ্বস্থ সকল।
মুকুন্দ বিস্ময়ে দেখি বিরাট পুরুষরূপ, পড়িল চরণে জ্যোতির্ময়।
হাসি হাসি কহে প্রভু—"মুকুন্দ, তোমার কাছে হইলাম আজি পরাজয়।
অতুল বিশ্বাস তব, অসীম ভক্তিতে আর, আজি তুমি কিনিলে আমায় ;
করিয়াছি পরিহাস, তুমি প্রিয়তম মম, বাস মম তোমার জিহ্বায়।
আমার গায়ক তুমি ; আমার করের বাঁশী তব কণ্ঠে বর্ষে নিরন্তর ,
প্রেমভক্তি সুধাধারা, গোমুখীর ধারামত, দ্রব করি পাষাণ অন্তর।
যখন যখন হবে পাপপূর্ণ ধরাতলে যুগে যুগে মম অবতার,
তখন তখন তুমি মুকুন্দ মধুর-কণ্ঠ হবে তুমি গায়ক আমার।"

মুকুন্দ মধুর-কণ্ঠ ! তোমার স্বদেশী আমি, দিয়া সুধা কণ্ঠের তোমার,
এই শুষ্ক কবিতায়, কৃপা করি দেও তুমি প্রভুর চরণে উপহার।

পোহাল সুখের নিশি, মূর্ছিত হইয়া প্রভু পড়িলা ধরায় অচেতন।
রহিলেন বহুক্ষণ, নাহি জীবনের চিহ্ন ; চিন্তিত হইল ভক্তগণ।
করিলে কীর্তন সবে, নিমাই মেলিয়া আঁখি, উঠিলেন যেন স্বপ্নোত্থিত ;
কহিলেন, "কোথা আমি ? তোমরা এখানে কেন ? কি দেখিছ হইয়া বিস্মিত ?
আমি কি চাপল্য কিছু করিয়াছি ? ক্ষমা কর, কিছু নাহি স্মরণ আমার।
আমার শরীর নহে আমার আয়ত্ত আর।" দেখে সবে—মূর্তি দীনতার !

অষ্টম সর্গ

ভাবাবেশ

ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়স এখন, কি লাবণ্য গৌর অঙ্গে প্রথম যৌবন।
অবিরত দুনয়নে বহে বারিধারা ; আবেগে অবশ কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা।
ব্যাকুলা জননী কহে—"নিমাই ! নিমাই ! কেন কাঁদ, কহ বাছা ! বড় ব্যথা পাই।
কি পীড়া তোমার ?" পুত্র রহে নিরুত্তর। আবার আবার মাতা জিজ্ঞাসে কাতর।
"নাহি জানি মাগো!" কহে "কি পীড়া আমার, কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা হয় অনিবার।"
ব্যাকুল হইয়া কহে আসিলে শর্বরী.—"কৃষ্ণ না আইল, পোহাইল বিভাবরী !"

কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি হইল প্রভাত, কহে—"এলো সন্ধ্যা, নাহি এলো প্রাণনাথ।"
"কোথা কৃষ্ণ ?"—একদিন জিজ্ঞাসে কাতর, "কৃষ্ণ তব হৃদয়েতে"—কহে গদাধর।
নিমাই নখেতে বুক করিতে বিদার, ধরিলেন গদাধর করিয়া চীৎকার,
কাঁদিয়া উঠিলা শচী; নিমাই মূর্ছিত, ধরায় হৃদয় বাহি বহিছে শোণিত।
"কি হইল ?" কহে শচী; কহে প্রতিবাসী—"ভীষণ উন্মাদ রোগ।" মৃদু মৃদু হাসি,
"বাঁধি হস্তপদ, দাও, স্নিগ্ধ ভাবজল, যাবৎ উন্মাদ-রোগ না হয় প্রবল।"
কহেন শ্রীবাস হাসি—"রে পাষণ্ডী সব! এযে মহাভক্তিযোগ, দেবের দুর্লভ।"
কহেন উচ্ছ্বাসে কাঁদি—"নিমাই! নিমাই! এমন উন্মাদরোগ আমি যেন পাই।"
শুনিয়া নিমাই কহে করি আলিঙ্গন—"পণ্ডিত। কৃতার্থ মম হইল জীবন।
তুমিও উন্মাদ রোগ কহিলে, নিশ্চয় পশিতাম আমি আজি জাহ্নবী-হৃদয়।"
অদ্বৈত, সপ্ততি বর্ষ, বৃদ্ধ সুপণ্ডিত, শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ভক্তি-বিচলিত
হৃদয়ে, পূজান্তে বসি গৃহে আপনার, কহিছেন—"হায় কৃষ্ণ। প্রেমপারাবার,
পাপে পূর্ণ ধরা, কবে আসিবে আবার ?" একি রূপ। ফিরাইয়া সজল নয়ন,
আঙ্গিনায় দাড়াইয়া ওকে দুইজন ? নিমাই ও গদাধর,—মেলিল নয়ন,
সিন্ধু যেন সুধাকর করিল দর্শন।
সেই বৃদ্ধ ঋষিরূপ প্রেমে টলটল, দেখি প্রেম-পারাবার হইল চঞ্চল।
পড়িলা নিমাই ভূমে হইয়া মূর্ছিত, সোনার প্রতিমা, দুই বাহু প্রসারিত।
ভাবেতে বিভোর বৃদ্ধ দেখিলা তখন, অনন্ত শয্যায় যেন শায়ী নারায়ণ।
আনি গঙ্গাজল, আনি তুলসী চন্দন, নিমাইর পডি স্তব করিলা অর্পণ।
জনরব শতমুখে করিল প্রচার, আবির্ভূত নবদ্বীপে গৌর অবতার।
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, তৈলঙ্গ, মগধ হইতে আসিলা কত ভক্ত পারিষদ।
একদা নিমাই বসি সঙ্গে ভক্তগণ; মুকুন্দ ভারতী আসি প্রসন্ন বদন
কহে—"অবধূত এক, অপূর্ব দর্শন, আসিয়াছে নবদ্বীপে সঙ্গে শিষ্যগণ।
তেজঃপুঞ্জ মহামূর্তি, মহামল্ল বেশ, নাম নিত্যানন্দ, নিত্য আনন্দে আবেশ।
নন্দন আচার্য্য গৃহে করিছে বিশ্রাম; ছুটিয়াছে নবদ্বীপ স্রোতে অবিরাম
দেখিতে এ অবধূত। কহিছে সকলে 'বিশ্বরূপ'—নবদ্বীপ পূর্ণ কোলাহলে।"
ছুটিলা নিমাই, সঙ্গে ভক্ত অনুচর; দেখিলা, রহিলা স্থির চাহি পরস্পর
চিত্রার্পিত প্রায়; বহি অশ্রু দরদর, ভিজিতেছে উভয়ের বক্ষ কলেবর।
ভাবাবিষ্ট দুই ভাই, দুই ভাই পানে চেয়ে আছে, কি উচ্ছ্বাস উভয়ের প্রাণে।
আবিষ্ট নিমাই দেখে সম্মুখে বিহার করিতেছে বলরাম মূর্তি করুণার,
ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ করিছে দর্শন ষড়্‌ভুজ মহামূর্তি নয়ন রঞ্জন।

চলিলা নিমাই গৃহে, সহ সঙ্গিগণ
বেষ্টি নিত্যানন্দ, মাতৃপ্রেমে আত্মহারা, বহিতেছে দুনয়নে অবিরল ধারা।
"বাপ বিশ্বরূপ মোর"।—কাঁদিয়া জননী মূর্ছিতা পড়িতেছিলা, নিতাই অমনি

"মা আমার ! মা আমার !"—কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে লইলেন জননীকে হৃদয়ে কাতরে।
উভয় মূর্ছিত শোকে। কাঁদিছে নিমাই, কাঁদিছেন নরনারী, কথা-মুখে নাই !…
"বাপ ! বাপ !" ক্ষীণকণ্ঠে করিয়া ক্রন্দন উঠিলেন শচীমাতা পাইয়া চেতনা।
লয়ে পুত্রশির বুকে, চুম্বি শতবার, কহিলেন—"এতদিনে বাপরে আমার !
দুঃখিনী মায়েরে তোর পড়িল কি মনে ? এতদিনে মা ! মা ! ডাক শুনিনু শ্রবণে।
বার বৎসরের শিশু করিলি সন্ন্যাস, কুড়িটি বৎসর গত, দিনে কত মাস !
তোর শোকে পিতা তোর গেলা স্বর্গধাম ! হয়েছি পাষাণী আমি, বিধি মোরে বাম।"
মুছি নয়নের অবিরল অশ্রুধারা কহিলেন শচীমাতা—"নয়নের তারা
এই অভাগীর, বাপ, তোরা দুটি ভাই, তোমাকে সন্ন্যাসী দেখি বড় দুঃখ পাই।
ধর যজ্ঞসূত্র, কর বিবাহ এখন, কুড়ি বৎসরের অশ্রু কর বিমোচন
জননীর, গৃহ সুখে থাক দুইজন, যদবধি অভাগিনী মুদি দু'নয়ন।
হৃদয়-মৃণাল শুষ্ক, করিয়া জীবিত, থাক দুই ভাই দুই পদ্ম প্রস্ফুটিত।"
"মা আমার ! মা আমার !" উচ্ছ্বাসে তখন কহিলা নিতাই কাঁদি—"করিব পালন
আজ্ঞা তোর, আজি মম খুলিল নয়ন, পাইল এ পুত্র তোর নবীন জীবন।
দুই ভাই উদ্ধারিতে পারি যেন নর, শিরে দিয়ে দুই কর আশীর্বাদ কর।"
হাসিলা নিমাই,—অন্য বিস্মিত সবাই, কি কথা ! সন্ন্যাস ভ্রষ্ট হইবে নিতাই !

নবম সর্গ

পাষণ্ড

একদা কহিলা নিমাই হাসিয়া, করিব কীর্তনে লীলা অভিনয়,
প্রভু মাসীপতি চন্দ্রশেখরের আলয়ে মিলিল নরনারীচয়।
আসিলেন শচী সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, আসিলা সকল ভক্ত-পরিবার
উঠিল বাজিয়া খোল-করতাল মন্দিরার সহ মেঘমন্দ্রাকার।
মুকুন্দের কণ্ঠ উঠিয়া গগনে নৈশ শান্তি-বক্ষে সুধার রাশি
ঢালিছে, বাজিছে ব্রজকুঞ্জবনে নিবিড় নিশীথে শ্যামের বাঁশি।…
সাজে হরিদাস বৈকুণ্ঠ কোটাল, দুই মহা গোঁফ বাতাসে উড়ি,
রমা গদাধর, শ্রীবাস নারদ, সাজিলা নিতাই বড়াই বুড়ী।
রুক্মিণী-হরণ হবে অভিনীত নিমাই-রুক্মিণী বিহ্বল-হৃদয় ;
অন্যে কি চিনিবে, নিজে শচীমাতা না চিনে বিস্ময়ে চাহিয়া রয়।
রুক্মিণীর ভাবে হইয়া বিভোর, লিখিছেন পত্র নয়ন-জলে,
পত্র ধরাতল, অঙ্গুলী লেখনী, কৃষ্ণ-কামানল হৃদয়ে জ্বলে।
পড়িছেন পত্র, কি কণ্ঠ করুণ ! প্রেম কাতরতা করুণ কেমন !
প্রেমে আত্মহারা শুনি নরনারী, দেখি কাতরতা, শুনিয়া ক্রন্দন।

সে কাতর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাইছে মুকুন্দ দ্রবিয়া পাষাণ।
ভাবেতে বিহ্বলা উঠিয়া রুক্মিণী নাচিছে চলিয়া নাহি কিছু জ্ঞান!…
ঊর্ধ্ববাহু করি নাচে ভক্তগণ, করে উভরায় কাতর ক্রন্দন;
শচীর চরণে দিয়া গড়াগড়ি কাঁদিতেছে গৃহে পতিব্রতাগণ।
কাঁদিছেন শচী গলায় গলায়, সুখের শর্বরী পোহাল তখন;
বঙ্গেতে পবিত্র যাত্রা অভিনয়, হইল সূচিত এরূপে প্রথম।…
এইরূপে একদিকে নবদ্বীপে ছুটিল ভক্তির প্রবাহ বন্যার,
আসে দিবানিশি স্রোতে নরনারী করিতে দর্শন; দিতে উপহার।
অন্যদিকে ঘোর হিংসা পাপিষ্ঠের ছুটিল প্রবাহে বৈতরণী মত;
ক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পণ্ডিত-মণ্ডল, কত মতে হিংসা করে অবিরত।…
আসিয়া শ্রীবাস বিষন্ন বদন কহিলা—"আসন্ন বিপদ বিষম!
সমস্ত পণ্ডিত করিয়া মন্ত্রণা করেছে নালিশ কাজীর সদন।
ক্রোধে কাজী আসি খোল করতাল ভাঙ্গিল যাহার পাইল যথায়,
ধরিছে মারিছে যারে পায় যথা সর্বনবদ্বীপ করে হায় হায়!
কহে পণ্ডিতেরা—'নিক হরিনাম মনে মনে; হুড়াহুড়ি ধর্ম নয়।
বেদ লঙ্ঘনের উচিত এ দণ্ড; নাহি ইহাদের জাতিনাশে ভয়'।
রহি মৌনভাবে করোপরে শির, কহিলেন প্রভু হাসিয়া তখন—
'দেও এ ঘোষণা, কালি অপরাহ্নে হবে নবদ্বীপে নগরকীর্তন।'

দশম সর্গ

পতিতোদ্ধার

সেই অপরাহ্নে উঠিল বাজিয়া, শত শত খোল, শত করতাল;
শত শত শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসা; ছেয়ে অপরাহ্ণ-রবি-কর-জাল
উড়িল আকাশে পতাকা নিশান শত শত দণ্ডে বিচিত্র বরণ;
লোকারণ্য শচী মাতার দুয়ারে; হরিধ্বনি পূর্ণ হইল গগন।
ছুটিল কীর্তন-স্রোত রাজপথে লীলা ত্রিতরঙ্গে সম্প্রদায়ে তিন,
আসে নাচে গায় আচার্য্য সদল, আনন্দে অবশ, প্রেমে বাহুহীন।
মধ্যে হরিদাস অতি দীনহীন নাচিয়া গাইয়া প্রেমানন্দে ভাসি;
পরে শ্রীনিবাস গাইয়া নাচিয়া কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট আনন্দরাশি।
সর্বশেষে প্রেমে পূর্ণ আত্মহারা কনক বিগ্রহ প্রভু জ্যোতির্ময়,
চাচর চিকুরে মালতীর মালা, ললাটে চন্দন ফাগুবিন্দুচয়।…
চন্দ্রকলাধরে হাসি জ্যোৎস্নার, দুলিতেছে সুকর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল;
দীর্ঘ সিংহগ্রীবা, অংস সমুন্নত, সুপীন হৃদয়-গগন উজ্জ্বল!…

চন্দনে চর্চিত সর্বকলেবর, চন্দনে চর্চিত তুলি বাহুদ্বয়,
নাচিছেন প্রভু হরি হরি বলি, দুই পদ্মনেত্রে প্রেমধারা বয়।
পুলকে স্বর্ণ কদম্বে পুষ্পিত, দীর্ঘ দেবদেহ লীলায় মধুর ;
ভকতের বাঞ্ছা চরণকমলে বাজিছে লীলায় মধুর নূপুর !
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল বাজিছে গভীরে জলধর-স্বন।
বাজে রামশিঙ্গা রহিয়া রহিয়া গভীর নিস্বনে পূরিয়া গগন !
যাইতেছে বেড়িয়া প্রেমেতে বিহ্বল মুকুন্দ মুরারি গোবিন্দ রামাই ;
উর্দ্ধাবিষ্ট নেত্র, দুই বাহু তুলি 'বোল বোল বলি' নাচিছে নিমাই।
দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ গদাধর, পড়িতে আবেশে রাখিছেন ধরি ;
কখনও ভূতলে পড়িয়া আবেশে সোনার পুতুল যায় গড়াগড়ি।
সর্কাদি কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, নারিকেল, আম্রপল্লব আর ;
দধি দূর্বাধান্য ঘৃতের প্রদীপ গৃহ-দ্বারে দ্বারে শোভে নদীয়ার !···
শত শত কণ্ঠে রহিয়া রহিয়া উঠে হরিধ্বনি পবিত্র গম্ভীর,
রহিয়া রহিয়া উঠে হুলুধ্বনি, সহস্র সহস্র কণ্ঠে রমণীর।
বাজে গৃহে গৃহে শঙ্খ শত শত, শত শত ঘণ্টা কাংস্য অগণন,
মঙ্গল-উৎসবে উন্মত্ত নগর করে খই কড়ি পুষ্প বরিষণ !···
নগর নগর করিয়া উদ্ধার গেলা প্রভু গঙ্গাঘাটে আপনার,
চলিল কীর্তন স্রোত তীরে তীরে জগাই মাধাই ঘাটে এইবার।
নিজ গৃহ-দ্বারে দাঁড়ায়ে দুই ভাই দেখে সবিস্ময়ে নদীয়া নগর
আসিছে ভাঙ্গিয়া কি অনন্ত স্রোতে, অনন্ত তরঙ্গে, কি বিস্ময়কর।···
সংকীতন দল, নিত্যানন্দ আগে, নাচিয়া গাইয়া আসিলে কাছে,
ছুটিয়া মাধাই আগুলিল পথ ; হরি ! হরি ! বলি নিতাই নাচে।···
প্রেমেতে বিহ্বল কহিলা নিতাই—"ভাইরে মাধাই ! আয় দিব কোল !
আর পাপে পূর্ণ না করিস্ ধরা একবার মুখে হরি হরি বোল !
কহিল মাধাই ক্রোধে—"শাক্ত আমি, লব হরিনাম ওরে অবধূত !
দেখি তোর ঘাড়ে আছে কটি মাথা, চিনিসনা তুই তোর যমদূত !"
তুলিয়া লইয়া কলসীর কানা ক্রোধে গরজিয়া করিল প্রহার
নিত্যানন্দ-শিরে ; যেন রক্তগঙ্গা ছুটিল পবিত্র শোণিত ধারার।
কলসীর কানা হানিতে আবার, বেগে দৃঢ় করে ধরিয়ে জগাই ;
কহিল উচ্ছ্বাসে—"কি কর ! কি কর ! বিদেশী সন্ন্যাসী কেন মার ভাই !"
থামিল কীর্তন ; মহা হাহাকার উঠিল তখন ; বিস্ময়ে চাহি,
দেখিলেন প্রভু হাসিছে নিতাই, ঝরিছে শোণিত ললাট বাহি।
কৃষ্ণভাবাবেশে আবিষ্ট বিভোর "চক্র" ! "চক্র" ক্রোধে গর্জিল তখন,
দেখিল জগাই, মাধাই, নিতাই, অন্তরীক্ষে অগ্নি-চক্র বিভীষণ।
রক্ত চাপি করে উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া কহিলা নিতাই—"কি কর ! কি কর !

আত্ম বিস্মরণ কেন বলো হেন ? শান্ত হও, প্রভু ! ক্রোধ পরিহর ?
ভুলিলে কি, নহে দুষ্কৃতি সংহার, নবদ্বীপ লীলা পতিত পাবন।
ভুলিলে কি নহে চক্র সুদর্শন, নবদ্বীপ লীলা-চক্র সংকীর্তন।
বিশেষ জগাই মারে নি আমায় ; মাধাই মারিতে রাখিল জগাই।
দৈবে রক্ত পড়ে, দুঃখ নাহি পাই, ভিক্ষা দেও প্রভু, ! এই দুই ভাই !"
জগাইরে প্রভু করি আলিঙ্গন কহিলা কাঁদিয়া—"জগাই ! জগাই !
আজি তুই ভাই কিনিলি আমারে, রাখি নিত্যানন্দে প্রাণসম ভাই।
আজি কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে, যে অভীষ্ট তব চাহ সেই বর,
হউক তোমার প্রেমভক্তি লাভ।" দুনয়নে অশ্রু বহে দরদর।
মাধাইর প্রাণে ধীরে ধীরে ধীরে করি মদিরার মাদকতা দূর,
কি যেন অমৃত হইল সঞ্চার, পড়িল কাঁদিয়া চরণে প্রভুর।
কহে—"দুইজন করিলাম পাপ, কেন তব কৃপা কর দুই ভাগ ?
দেও এ পাপীকে দেও তব নাম, দেও প্রেম ভক্তি পুণ্যে অনুরাগ।
প্রভু কহে—"তোর নাই পরিত্রাণ, নিত্যানন্দ অঙ্গে করিলি আঘাত ;
তিনিই পাবেন ক্ষমিতে কেবল, করেছিস্ তাঁর অঙ্গে রক্তপাত।"
করুণার সিন্ধু প্রভু নিত্যানন্দ কহিলা কাঁদিয়া—"একি লীলা ভাই।
তুমিই করিবে পতিত উদ্ধার, আমি পাষাণের সেই শক্তি নাই।···
আয়রে মাধাই বল হরিবোল। আয় ভাই আয়, আয় কোলে আয়।
মেরেছিস তুই কলসীর কানা, তাব'লে কি প্রেম দিবনারে আয় !"
তুলি মাধাইকে লইলেন বুকে, মূর্ছিত চরণে পড়িল মাধাই।
লক্ষ নরনারী—হরিবোল হরি !—গাইল, কাহারো শুষ্ক নেত্র নাই।··
নীরবতা বক্ষে উঠিল ভাসিয়া প্রভুর শ্রীকণ্ঠ করুণ গম্ভীর ;
কহিলেন প্রভু অঞ্জলি পাতিয়া, পুলকে পুষ্পিত পবিত্র শরীর—
"দেও জগন্নাথ ! মাধব ! আমায় তামা ও তুলসীসহ গঙ্গাজল,
দেও, তোমাদের পাপ কর দান, হও দুই ভাই পবিত্র নির্মল।"
কাঁদি উচ্চকণ্ঠে জগাই মাধাই পড়ি দান-মন্ত্র পবিত্র মধুর
মহাপাপী দুই মহাপাপরাশি করিল উৎসর্গ শ্রীকরে প্রভুর।
আবার বাজিয়া উঠিল মৃদঙ্গ, বাজিল মন্দিরা শঙ্খ করতাল,
উড়িল আকাশে পতাকা অনন্ত, জ্বলিল ভূতলে অসংখ্য মশাল।
ছুটিলেন কাজী, দাঁড়াইয়া পথে দেখিলা কি দৃশ্য, আঁখি ছলছল
যতদূর চক্ষে চাইতেছে দেখা, লোকারণ্য তীর, জাহ্নবীর জল !
ঘন হরিধ্বনি, ঘন হুলুধ্বনি, নাচে নরনারী আনন্দে অধীর,
নাচে সংখ্যাতীত পতাকা মশাল, নাচে প্রতিবিম্ব জলে জাহ্নবীর।
গঙ্গাস্রোত মত সংকীর্তন স্রোত চলিল বহিয়া কাজীর আলয় ;
ওকি নাচে আহা ! ওই দেবরূপ, ওই নৃত্যগীত মানুষের নয়।

নাচে আগে আগে জগাই মাধাই, দিয়া করতালি ভক্তিতে বিহ্বল,
কভু পদতলে দেয় গড়াগড়ি, মহাপাপী-নেত্রে বহিতেছে জল।
দেখিয়া কাজীকে করি আলিঙ্গন, কহে—"পাদপদ্মে পড় গিয়া ভাই ?
মারিলেও ভাই ! প্রেম করে দান, এমন ঠাকুর ত্রিজগতে নাই।"
দেখিছেন কাজী—মহা মরুভূমি, নাচে আত্মহারা লক্ষ নারী নর ;
ওকি মহামূর্তি ঘোষিছে গম্ভীর—"লা এলাহি আল্লা। আল্লা হো আকবর !"
ইল্লাহা ইল্লল্লা,—একই ঈশ্বর ; আল্লা হো আকবর—দয়ার সাগর,
শুনিলেন কাজী, পড়িলেন কাজী, মূর্ছিত প্রভুর চরণ উপর।
দেখিলেন শশী কি মহামিলন ! দেখিলেন কিবা মহা আলিঙ্গন !
আকবরের নীতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, ভারতের মহাপ্রয়াগ সঙ্গম।
এই মহানীতি, এ মহামিলন বুঝিলনা আরঙ্গজেব অল্পপ্রাণ !
হায় মা ! হায় মা ! বুঝিবে কি কভু তোর দুই পুত্র হিন্দু-মুসলমান ?

একাদশ সর্গ

সন্ন্যাস সংকল্প

'ন্যায়'-ক্ষেত্র নবদ্বীপ, নাস্তিক পণ্ডিত দল, কামিনী-কাঞ্চন মাত্র জীবনের মোক্ষ ফল।
লুপ্ত মন্ত্র, শক্তি-পূজা ; নাহি দেশরক্ষা ব্রত, হইয়াছে 'বীরাচার' 'বামাচারে' পরিণত।
আছে শক্তি মূর্ত্তি মাত্র, আছে শুষ্ক পূজা আর, নাহি শক্তি নাহি শাক্ত, আছে উপহাস তার।
নাহি আত্মবলিদান, আছে ছাগবলিদান, ধর্মের মূরতি আছে, মূরতির নাহি প্রাণ।
জাতিভেদ ধর্মভেদ ; ভেদপূর্ণ কুলাচার ; ভেদবিষে জর্জরিত সমাজের হাহাকার
উঠিয়াছে চারিদিকে ! ঘোরতর নির্যাতন সহিতেছে নিম্নজাতি পশুবৎ নিরমম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতি চতুষ্টয় নাহি গুণগত, এবে জন্মগত সমুদয়।
মহামূর্খ, ঘোরতর পাপিষ্ঠ ও নরাধম ব্রাহ্মণ সন্তান যদি তথাপি সে ব্রাহ্মণ।
চণ্ডাল চণ্ডাল মাত্র হলেও সাধুপরম, ছায়া তার কলুষিত, মহাপাপ পরশন !…
এমন সময় আহা উঠিল কি সাম্যগান ! সমান সকল জীব ; কিবা হিন্দু মুসলমান !
যথা রবি-শশি-করে, যথা মুক্ত সমীরণে সকলের অধিকার সমভাবে সর্বক্ষণে।
কিবা ধনী, কিবা দীন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর, এই ধর্মে সকলের সমভাবে অধিকার।…
চণ্ডাল হইলে ভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেয় ; অভক্ত ব্রাহ্মণ তথা চণ্ডাল হইতে হেয়।
নাহি চাহি যাগ, যজ্ঞ, নাহি চাহি বলিদান, নাহি উচ্চ, নীচ জাতি, গাও সবে কৃষ্ণ নাম।…
খোল করতাল মাত্র এ পূজার উপচার, মাত্র মন্ত্র হরিনাম, ভক্তিমাত্র উপহার।
নাহি চাহি পুরোহিত, নাহি চাহি তন্ত্রধার, কিবা শাস্ত্র কি পদ্ধতি নাহি চাহি এ পূজায়।
এই কাঙ্গালের ধর্ম, কাঙ্গালের আশাবাণী শুনিল ব্রাহ্মণেতর জাতি নিপীড়িত প্রাণী।…

স্মৃতির বন্ধন ছিঁড়ি, ব্রাহ্মণের স্বার্থজাল, চরণে দলিত জাতি কি প্রবাহে সুবিশাল
ছুটিল জাহ্নবী-স্রোতে নবপ্রেমধর্ম ভাসি দলিত পীড়িত প্রাণে পান করি সুধারাশি।…
তখন পণ্ডিত দলে হলো মহা কোলাহল, শিরে করি করাঘাত, নেত্রে অশ্রু ছল-ছল,
সকলে কহিল কাঁদি—"শিষ্য কারো নাহি আর, নাহি ব্রত, নাহি পূজা, নাহি শ্রাদ্ধ, ফলাহার,
কি কব দুঃখের কথা,—মুণ্ডপাত দক্ষিণার!
ক্ষেপেছে সমস্ত দেশ, শুধু মুখে হরি! হরি! নিমাইর পদতলে দেয় শুধু গড়াগড়ি!"
কহে তর্করত্ন খেদে—"শিষ্য ত নাহি কাহার; জাতিধর্ম ব্রাহ্মণের না রহিল দেশে আর।…
মার জাতি নিমায়ের, হরিবোলাদের আর, বন্ধ কর হুঁকা জল, ক্রিয়া কর্ম লোকাচার"।…
উঠিল কি দেশব্যাপী ঘোরতর কোলাহল, জ্বলিল ভীষণবেগে সামাজিক দাবানল।
আসি ভক্ত দলে দলে কহে করি হাহাকার—"হায় প্রভু! ভক্তগণে রক্ষা কর এইবার।"
শুনি কহিলেন প্রভু হাসি উচ্চ হাসি তবে—"প্রহ্লাদের মত রক্ষা করিবেন হরি সবে।
করিনু পিপ্পলীখণ্ড, হবে কফ নিবারণ, উলটিয়া কফ আরো বাড়িল যে বিলক্ষণ।"
ক্ষণেক নীরব রহি, নিত্যানন্দ করে ধরি, বসি নিরজনে প্রভু, কহিলেন—"হরি! হরি!
শ্রীপাদ! কোথায় প্রেমে ভাসাইব ধরাতল, জ্বালিল বিদ্বেষ বিষ এই হিংসা দাবানল!…
কাটি এই শিখা-সূত্র, মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, শ্রীপাদ! লইব আমি তোমার সন্ন্যাসিবেশ।
যাহারা আমাকে, দেব! চাহিতেছে মারিবারে, বেড়াইব ভিক্ষা করি তাহাদের দ্বারে দ্বারে।'
সন্ন্যাস লইলে আমি সবে দিব হরিনাম, সন্ন্যাসীকে হিংসা নাহি করবে কেহ, ভগবান্।…
নিত্যানন্দ প্রভু শিরে হায়! যেন অকস্মাৎ হইল বিকট শব্দে ভীষণ অশনিপাত।
ক্ষণেক নীরব রহি করি আত্ম-সংবরণ, কহিলা নিতাই ধীরে, শোকে উদ্বেলিত মন,
আসন্ন ঝটিকা শান্ত—"প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়; যাহা তব ইচ্ছা, তুমি করিবে তাহা নিশ্চয়।'
বিধি বা নিষেধ বল কে তোমারে দিতে পারে? বালির বন্ধন পারে রোধিতে কি পারাবারে?…
"হায়! প্রভু! একি কথা!" মুকুন্দ পড়ে মূর্ছিত; প্রভু লইলেন বুকে; মুকুন্দ লভি সংবিৎ,
কহিল কাঁদিয়া শোকে—"প্রভু! একি কথা হায়, তোমার মুকুন্দ, প্রভু! মরিবে ডুবি গঙ্গায়!
এই নবদ্বীপ আজি নব-বৃন্দাবন ধাম; পুষ্পাকীর্ণ কুঞ্জবন করো না মহাশ্মশান!
এ সুন্দর নাট্যশালা! এই সুমধুর গান; ভাঙ্গিও না হায়! প্রভু! করো না মহাশ্মশান!…"
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি বজ্রাহত গদাধর কহে—"প্রভু একি কথা পরম বিস্ময়কর!
শিখাসূত্র ঘুচাইলে মাত্র যদি কৃষ্ণ পাই, গৃহাশ্রমে তব মতে তবে কি বৈষ্ণব নাই?…

সন্ন্যাসীর নাহি পুত্র, নাহি পিতামাতা আর, নাহি পত্নী, নাহি প্রভু, মরুময় এ সংসার।
সন্ন্যাসীরা মায়াবাদী, কেমনে পাইবে তারা শান্ত-দাস্য-বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ধারা?
হায়! প্রভু, হেন কথা আনিও না মুখে আর; তোমার এ প্রেম-হাট ভাঙ্গিও না
নদীয়ার।…
মরিবে ভকতগণ, মরিবে জননী আর হায়! সে বালিকা বধূ, কি দশা হইবে তার?"—
নিমাইরে লয়ে বুকে, শোকোন্মত্ত গদাধর কাঁদিতে লাগিল উচ্চে, কাঁদিলেন বিশ্বম্ভর।
বহিল বিদ্যুদ্বেগে এই শোক-সমাচার, ছুটিল বিদ্যুদাহত ভক্ত করি হাহাকার।…
ভক্তের রোদনে প্রভু হইলেন বিচলিত, করুণ নয়নে বহে দর অশ্রু বিগলিত।
তুলি অবনত মুখ, সুধাসিক্ত শতদল, কহিলা করুণাময়, মুছি করে অশ্রুজল;…
"ত্যজ-এই কাতরতা, এই চিন্তা অকারণ; তোমরা যেখানে রবে, আমি তথা সর্বক্ষণ।…
শ্রীকৃষ্ণ করুন কৃপা,—যেন তোমাদের সঙ্গে জন্মে জন্মে থাকি আমি এই সংকীর্তন রঙ্গে।"

দ্বাদশ সর্গ

বিদায়

আপন কুটীরে বসিয়া পূজায়
শচীমা আছেন ধ্যানে;
মা! মা! মা! ডাকিয়া নিমাই
আসিলেন সেইখানে।…
"এস বাপ, এস!" কহিলা জননী—
করুন শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণ তোমার!
একি কথা লোকে করে কানাকানি,
তুমি গৃহে, বাপ! রবে না আর।
বিশ্বরূপ, বাপ ছাড়িল যেদিন
মরিল সেদিন জননী তোমার;
শোকের উপরে সব কত শোক?
তুমি কি মড়াকে মারিবে আবার?…
আবার জননী কহিলা কাতরে,…
দয়া তব সর্বজীবে;
নিমাই! কেবল নিজজনে তব
এরূপ কি দুঃখ দিবে?
এ বৃদ্ধা জননী, কিশোর ঘরণী,
তাহারা কি জীব নয়?
তোমার সন্ন্যাসে মরিবে তাহারা

মরিবে ভক্ত-নিচয়।··

নয়টি সন্তান একে একে একে

হারায়ে পাষাণী আমি

আছিরে বাঁচিয়া নিমাই রে ! তোর

দেখি চাঁদ মুখখানি।···

ত্রয়োদশ মাস সাজিয়া যোগিনী,

শিরে কেশ জটাভার,

ত্রয়োদশ মাস জপি হরিনাম

করিয়া অম্বু আহার,

পাইয়াছি তোরে, নিমাই আমার

তুই কি আমারে ছাড়ি

করিবি সন্ন্যাস, অকরুণ প্রাণে

এরূপে সবাকে মারি ?

নিমাই-সন্ন্যাস

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

নবদ্বীপ

প্রতিবাসিগণ ও নিতাই

১ম প্রতি। শুনেছি মাথা মুড়িয়ে ভেক নিয়েছে।

২য় প্রতি। না ভাই, ওর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করে বড় ভাল করি নাই, ও মহাপুরুষ!

১ম প্রতি। আমি বলি, ও বড় ভাল করলে না, বুড়ো মা— যদি সন্ন্যাসীই হবে, তবে ফের বিয়ে করাই বা কেন?

২য় প্রতি। তুমি বুঝি বল, যে ব্যাটার সাতকুলে কেউ নাই, সে সন্ন্যাসী হলেই তার বাহার? মনের জোর বোঝ দেখি, এই আধিপত্যটা ছেড়ে চলে গেল, রাজারও তবু খাজনা সাধতে হয়, এর ভারে ভারে সামগ্রী যোগান দিচ্ছে। পরিবার—রূপে গুণে লক্ষ্মী বল, সরস্বতীই বল, এসব ছেড়ে চলে গেল। ইস্, এই লোকটাকে অসাধু বলতেম হে।

১ম প্রতি। তোমারও দেখ্‌ছি যে ভক্তির ঢেউ উথ্‌লে উঠ্‌ছে।

২য় প্রতি। না বাবা, প্রাণে ধোঁকা খেয়েছে, এর ভাবটা কিছু বুঝতে পাচ্চি না, অমন জগা মাধা

[নিতাইয়ের প্রবেশ]

১ম প্রতি। ঐ দেখ বাবা! ধ্বজা দেখা দিয়েছে, বীর বলাই ফিরেছে,·· বলি বাবাজী কি একেবারে নেয়ে এলে? পূজা আহ্নিক সব সেরে এলে—ভোগে বসবে বুঝি?··

২য় প্রতি।·· দুটো সাদা কথা কও না, শুন্‌ছি নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, কোথায় আছে জান কি?

নিতাই। শান্তিপুরে।

২য় প্রতি। নদেয় আসবে না?

নিতাই। সন্ন্যাসীর দেশে আসতে মানা।

২য় প্রতি। আচ্ছা, বলতে পার সন্ন্যাসী হল কেন?

১ম প্রতি। বুড়ো মা, যুবতী স্ত্রী ছেড়ে যাওয়া কি ভাল দেখায়?

নিতাই। নাহি জানি কিভাবে সন্ন্যাসী,

দু'নয়নে বারিধারাময়,
কভু মৌন রয়,
কভু রাধা বলে পড়ে ধরাতলে।

কভু উচ্চহাস, কভু বা হুঙ্কার,
কিভাব তাহার কেমনে বুঝিব বল ;
কভু হরি ব'লে নাচে বাহু তুলে,
কভু ঝাঁপ দেয় জলে,
পাগলের মতি নহে স্থির—
যারে তারে ধেয়ে কোল দেয় ;
কারু ধরে পায়,
কারে বলে দাসত্ব মোচন কর।
কিভাব গোরার—প্রাণ জানে তাঁর—
পাগল-হৃদয় কেমনে বুঝিবে বল ?

১ম প্রতি। না বাবা! ঘাট হয়েছে, যদি গান থামল ত ছড়া ধরলে, খুব মাতলামোটা ক'রে নিলে যা হোক, দেখ বুজরুকী বড় চলবে না হেতায় আর।

২য় প্রতি। বলি অবধূত ঠাকুর! চল্লে কেন? কথাটার জবাব দিয়ে যাও না? সোজা কথায় বলতে পার? আমি শান্তিপুর যাব, তার সঙ্গে দেখা হবে?

নিতাই।—(গীত) প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী।
প্রেমের দ্বারী আছে দ্বারে
করে মোহন বাঁশরী॥
বাঁশী বলছে রে সদাই,
প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই,—
ডাকছে দ্বারী আর ভিখারী,
জয় রাধা নাম গান করি,
রাধা ব'লে নয়ন-জলে ভাসে প্রেমের প্রহরী॥

[নিতাইয়ের প্রস্থান]

শচীদেবীর বাটী

শচী। কে রে, নীলমণি এলি? আয় বাবা, আয় কোলে আয়; আমি নয়ন জলে অন্ধ হয়েছি, তোকে দেখতে পাইনে। গোপাল। আর তো তোরে গোঠে যেতে দেব না, আমি পথ পানে চেয়ে ক্ষীর-সর-নবনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আয় গোপাল আয়! হাঁ রে, ঐ তো হাম্বারবে গোধন ফিরে এল, আমার ঘর-আলো নীলমণি তো এল না? গোপাল! দেখে যা, আমার পুরী শূন্য, প্রাণ শূন্য, শূন্য বৃন্দাবন, একবার দেখে যা, ধেনু তৃণ ছোঁয়না, গোঠে যায় না; নীলমণি! আর একবার মা বলে যা, মা বলা ধন—তো বই তো আর আমার নাই। কেও নীলমণি? বাবা! মাকে ভুলে কোথায় ছিলি? [নিতাইয়ের প্রবেশ]

নিতাই। মা! আশীর্বাদ করুন।

শচী। কে রে? কে রে? গোপাল কি ঘরে এলি?

নিতাই। মা, আমি নিতাই, তোমার নিমাইয়ের সংবাদ এনেছি।

শচী। বল, বল নিতাই আমায়,
কোথা আছে অঞ্চলের ধন?...

নিতাই। শান্তিপুরে অদ্বৈতের ভবনে প্রভুকে নিয়ে এসেছি, আপনার চরণদর্শন প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন।

শচী। চল যাই, আর কেন বিলম্ব করি? নিতাই, নিতাই! আমার নিমাইকে দেখতে পাব? বাবা! হরি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, আমার তাপিত প্রাণে বারি দিলি। আমি বৌমাকে সঙ্গে নিই, তুই একটু দাঁড়া।

নিতাই। মাগো! তাঁর যেতে মানা, তিনি গেলে প্রভুর নামে কলঙ্ক হবে।

শচী। অ্যাঁ! তবে কি হবে? আমার পাগ্‌লী মেয়েকে কে দেখবে? আহা! পরের বাছা এনে আমি এত জ্বালা দিলুম!

নিতাই। মা! তুমি তাঁরে বলে এস, আমি দোলা প্রস্তুত করিগে।

(নিতাইয়ের প্রস্থান)

শচী। আহা! আমি কি বলে বোঝাব, কি বলে শান্ত করব, আহা, বাছা আমার ছিন্ন কমলিনীর ন্যায় দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে। হা নিমাই! তোর মনে এই ছিল?

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, মা!

শচী। মা! তুমি অনেক সহ্য করেছো, কি করবো মা! কঠিন সন্ন্যাস ব্রত, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবার যো নাই। তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দাও, আমি তোমায় কি বুঝাব, নিমাই আমার শান্তিপুরে এসেছে, আমি সেখানে যাব, তুমি ঘরে থাক। মাগো! তুই চির-বিষাদিনী, আমি কি করবো, সন্ন্যাসীর স্ত্রীদর্শন নিষেধ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাও মা, যাও—বিধাতা আমার বাম, আমি চিরদিন জানি!

শচী। মা, তোরে কার কাছে রেখে যাব?

বিষ্ণুপ্রিয়া। জননি! তুমি ভেবো না, আমার স্বামী আমায় সঙ্গিনী দিয়েছেন,—এই মালা আমার সঙ্গিনী; আমার পতি সন্ন্যাসী আমি চির সন্ন্যাসিনী। মা! যাও—যারে বিধাতা বিমুখ তুমি কি করবে?

শচী। বাছারে, তোর অদৃষ্টে এত ছিল, আহা! মা কমলা, তোমায় অতল জলে আমি ফেলে দিলেম।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, তুমি যাও, পাগলের মন স্থির নয়, আবার যদি কোথাও চলে যান, সংবাদও পাব না; মা গো, রোদনই আমার আনন্দ, প্রভু আমায় কাঁদতে রেখে গেছেন।

শচী। তবে যাই মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, এস।

(শান্তিপুর—অদ্বৈতের বাটী)

নিমাই। মা, মা! আমায় কৃপা কর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

শচী। বাবা! তোমাকে লোকে কত বলে, কিন্তু বাবা, তুমি আমার সেই দুধের ছেলে নিমাই!

নিমাই। মা, আমি তোমার কুসন্তান, আজীবন দুঃখ দিয়েছি, তুমি আমায় মার্জনা কর। আমি সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেছি, কিন্তু তুমি যেখানে থাকতে বলবে, আমি সেইখানেই থাকবো; কেবল দেশে যাওয়া গৃহিণীর দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, আর তোমার সকল আজ্ঞা পালন কবব, অবুঝ সন্তান বলে মনকে প্রবোধ দাও; তুমি কাঁদলে আমার সন্ন্যাস ব্রত বিফল হবে, আমি কৃষ্ণ পাব না—আমার কলঙ্ক রটবে; প্রসন্নময়ী জননি! আমায় প্রসন্না হও।

শচী। বাবা, তুমি যাতে সুখী হও—তাই কর। একটি কথা রাখ, বিশ্বরূপের মত আমায় ভুলে থেক না, এক একবার দেখা দিও, আর আমি অধিক চাইনে।

নিমাই। মা, আমি বৃন্দাবনে যাত্রা ক'রবো, তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করে রয়েছি।

শচী। বাবা! তুমি নীলাচলে যাও, সেথাও ত ভগবান বিরাজমান, তোমার বৃন্দাবনে কাজ কি? হে ভক্তগণ, নীলাচলে থাকলে তোমরাও গমনাগমন করতে পারবে, আমিও আমার নিমাইয়ের সংবাদ পাব।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

নিমাই। তুমি কি আমায় কিছু বলবে?

স্ত্রীলোক। প্রভু, তুমি অন্তর্যামী, সকলই জান, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আমায় পাঠিয়েছেন; তিনি আমায় বলতে বলেছেন যে, এ সংসারে তিনিই কি অপরাধিনী? জীবের দুঃখভার মোচন করতে যে আপনি গোলোক ত্যজে এসেছেন, তিনি কি জীব নন?· কেবল তারে দুঃখ দেওয়াই কি আপনার সংকল্প? · তিনি সজল নয়নে বললেন—"প্রভু যদি বলতেন, আমিই তাঁর কন্টক, তা হ'লে আমি জাহ্নবীতে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর কন্টকমোচন করতেম।" আহা প্রভু, অবলার কি দুঃখ!·· এ জন্মে আর আপনার দর্শন পাবেন না। ·· প্রভু, আর যে বলে বলুক, যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেখেছে, সে তোমায় কখনও দয়াময় বলবে না ··।

নিমাই। আমার দশা দেখে যাও, আমিও সুখী নই, আমিও ধরাসনে, আমিও অনশনে, আমিও রোদনে কালযাপন করছি। · আমার প্রাণ-প্রিয়ার নিমিত্ত আমারও প্রাণ যে ব্যাকুল—তা কেবল তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝবেন, আর আমি কাকে বলে জানাব?·· জীবের দুঃখে আমার · সহিষ্ণু

সমদুঃখী আর কে আছে? যে কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, যদি সফল হয়,… সে কেবল তাঁরই কৃপায়; অধিক আর কি বলবো, এই আমার পাদুকা নাও, আমার পাদুকা নিয়ে তাঁকে কালহরণ করতে বল। আমি জানি, তিনি অতি দুঃখিনী, দেখে যাও—আমি ও অতি দুঃখী।

(মিশ্রের অন্তঃপুর)

বিষ্ণুপ্রিয়া। লো পাদুকে, তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী,
ভাগ্যবতী তুমি সতী!
আদরে তোমার—
শ্রীচরণ দেন পতি মোর,
বল সে আমার আর কি গো হবে।
সুধাকর সে অধর আর কি হেরিবে,
হেরি বঙ্কিম নয়ন—
লাজে সই, নয়ন ফিরাব,
লাজ ভুলি পুনঃ ফিরে চাব,
হবো লো আপন হারা,
সখি! সে কি ভুলে আছে,
বল লো কিসে ধৈর্য ধরি,
মরি মরি যোগীবেশে গেছে চলে—
যালো যালো সখি!
আন তুলে ফুল—মালতী বকুল
গাঁথিব চিকণ মালা,
বলে গেছে—আসিবে আসিবে প্রাণনাথ।
থরে থরে অগুরু চন্দন—
রাখ সখি, করিয়া যতন,
শ্রীঅঙ্গে লেপিব, সাধ পুরাইব,
দেখ সখি। ফুলে যেন বৃন্ত নাহি রহে,
কুসুম জিনিয়ে কমনীয় কায়ে
দেখ' যেন নাহি বাজে।…
কই সই! কই এল প্রাণনাথ?
কই কই প্রাণবঁধু!
কই সই, সে আমার?
আশা দিয়ে গেল ভুলাইয়ে,
কই কই এল সে নির্দয়?
ঝিশির শিশির ঝরেলো সজনি!
শুনি মৃদুধ্বনি চমকি অমনি,

ভাবি বুঝি মম গুণমনি আসে ;
সচকিতে চাই, আঁখি দুটি ভাসে।
ফুল-কলি চুমি আদরে সমীর ;
মম বঁধু বিনা হইলো অধীর।
কুহুরবে ঐ ডাকেলো কোকিল ;
প্রাণে সাধ মম নাহি আর তিল। ··
কই সে আমার কই সই এল ?
নিশি পোহাইল, শশী অস্তগেল।
ধিক, প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?
নিজ হস্তে জ্বালিব রে চিতা,
পতি পদে ঠেলে যারে—
তার আর কি কাজ সংসারে ?
ছি, ছি! আর কেন সব ?
জ্বালা জুড়াইব প্রাণ দিয়ে বিসর্জন ;
হা নির্দয়! দেখে যাও যায় প্রাণ। (মূর্ছা)·

(নিমাইয়েব আবির্ভাব)

নিমাই। ওঠো ওঠো চন্দ্রাননি।
তোমা বিনা আমি আর কার ?
দেব-দেহে সতত রহিব কাছে,
নর-দেহে ফিরি আমি জীবের উদ্ধারে।

(দেব-দেবীগণের প্রবেশ)

জনৈক দেব। স্বর্গে আর কিবা প্রয়োজন ?
এস করি সার্থক নয়ন,
যুগল মিলন হেব আজি ধরাতলে।

(গীত)

জয় জয় জয় যুগল ঠাম, জয় জয় গৌরাঙ্গ।
চাঁদে চাঁদে কিরণ ঠিকরে, চাঁদে চাঁদে রঙ্গ ॥
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি! ·
কলুষনাশন দীনতারণ, কনক-বরণধারী।
চূড়া ঝলমল বেণী দলদল, শোভিত কুসুমসারি।·
আমরা যুগলভাঙা দেখতে নারি।

আকর: নিমাই সন্ন্যাস (চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ)—প্রথম অভিনয় ২৮ জানুয়ারী, ১৮৮৫

'গোবিন্দদাসের করচা'র পথরেখা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

'গোবিন্দ দাসের করচা' যে কালে লিখিত হইয়াছিল, সেকাল ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের দিক দিয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র আপন আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইল, তারপর সেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল। এ দেশের ইতিহাস বলিতে এই। ১৩০৯ সালে প্রায় সমগ্র ভারতই পাঠান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অথচ ১৩৫১ সালে মহম্মদ তুঘলক ওরফে জুনাখানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের পতন হয়। উত্তর ভারত প্রায় কুড়িটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়—কোন কোনটি হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এবং দাক্ষিণাত্যে পাঠান সাম্রাজ্যেব পতনের পর, দুইটি বৃহৎ স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল—বিদারের বাহ্‌মনীরাজ্য এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য। বাহমনী রাজ্য তাপ্তী নদী হইতে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল কৃষ্ণানদী হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত।

'গোবিন্দের করচা' ১৫০৮-৯ সালে লিখিত হইয়াছিল। বাহমনী রাজ্যে তখন অস্তিত্বরক্ষার শেষ লড়াই চলিতেছে। বিদ্রোহী সেনাপতিরা ইতোপূর্বে সাম্রাজ্যের কিছু অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কুড়ি বৎসরেরও পূর্বে, বিজাপুর, আহম্মদনগর ও বেরার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুতুবশাহীরা অপেক্ষা করিতেছে, কাসিম বারির মৃত্যু হইলেই তাহারা বাহমনী সাম্রাজ্যের নামেমাত্র অধীনতাও পরিত্যাগ করিতে পারিবে। পক্ষান্তবে কাসিম বারি স্বয়ং বাহমনী সাম্রাজ্যের রাজধানীতেই রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে-সব হিন্দুরাজা সায়ন, মাধব ইত্যাদি মহাজ্ঞানীদের নির্দেশে দক্ষিণ-ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিতে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুর্বল বংশধরেরা এসময় শক্তিমান ধুরন্ধর মন্ত্রীদের হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছেন।

সুতরাং হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকল রাজ্যের রাজধানীতে তখন পরিস্থিতি অশান্ত এবং অপরাধের উৎসমুখ উন্মুক্ত। সীমান্ত অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল এবং ছোটখাটো সর্দারেরা এইসব দূরবর্তী এলাকার উপর নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতেছিল।

গোবিন্দের যাত্রাপথটি ছিল মোটামুটি সমুদ্রের উপকূল বরাবর। বাংলা হইতে সিন্ধু পর্যন্ত, উপকূলস্থ দেশগুলির প্রায় সবই ছিল হিন্দুদের হাতে।

চট্টগ্রাম হইতে গঙ্গার উত্তরে প্রসারিত বাংলার উপকূলভাগের অধিকাংশ ছিল

সুন্দরবন এলাকার হিন্দু নায়কদের হাতে। এই নায়কেরাই ষাট বৎসর পর সুন্দরবন এলাকার যশোহরে বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করে। উড়িয়াগণ তখন পর্যন্ত মুসলমানের আনুগত্য একেবারেই স্বীকার করেন নাই, গঙ্গার মুখ হইতে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ তাঁহাদের অধিকারে ছিল। তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় উৎকল-অব্দের এখনও প্রচলন আছে ; ইহাতে বুঝা যায় একদা এ অঞ্চলে উড়িয়াদের আধিপত্য ছিল। ১৪৭১ সালের কাছাকাছি সময়ে, উড়িষ্যার রাজপরিবারে অন্তর্বিবাদের সুযোগ নিয়ে বাহমনীরা উজীর খাজা মামুদ গাওয়ানের নেতৃত্বে কাণ্ডাপিল্লে (Kandapille) ও রাজমহেন্দ্রী দখল করে। কিন্তু ১৪৮১ সালে উজীর নিহত হইলে, আর কেহ এই দখলদাবির সুবিধা লইবার পূর্বেই, কালবিলম্ব না করিয়া, উড়িষ্যার রাজারা এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধার করেন।

গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী উপকূল ভাগে কোন রাজনৈতিক সুস্থিতি ছিল না। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ওয়রঙ্গল রাজ্য ১৪৩৪ সালে আহম্মদ শাহ বাহমনী কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু রাজধানী শহরটি তখনও ছিল অপরাজিত, হিন্দু রাজারা একের পর এক জীবন দিয়াও মুসলমান আগ্রাসনের প্রতিরোধ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মোহানার মধ্যবর্তী প্রদেশে বিজয়নগরের রাজাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এবং গোবিন্দের ভ্রমণের প্রায় সমকালে রাজ্যের মধ্যে প্রবল অশান্তি উত্তেজনা থাকিলেও, সমগ্র সাম্রাজ্য অটুট ছিল। কাবেরীর পর তাঞ্জোর ও মাদুরা রাজ্য, রামনাথ, সেতুপতি ও পদ্মকোটের নায়কদের এলাকা, তারপর কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত কেরল দেশ—ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল, এই রাজারা প্রায় সকলেই বিজয়নগরের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। কেরলের উত্তরে উপকূলস্থ গুবাকবন বা গোয়া দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যগুলির বিবাদের কারণ হইয়াছিল। গোয়া দখলের যুদ্ধে প্রথমদিকে প্রসিদ্ধ হিন্দুপণ্ডিত মাধবাচার্য সেনাপতিত্ব দান করেন এবং অসাধারণ রণনৈপুণ্যে মুসলমানদের দীর্ঘকাল কোণঠাসা করিয়া রাখেন। পর্তুগীজেরা মাত্র দশ বৎসর পূর্বে ভারতে আসিয়াছিল, তাহারাও এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটির উপর তাহাদের লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। গোয়ার উত্তরে সহ্যাদ্রি, কোঙ্কন পরে মামুদ গাওয়ানের হস্তগত হইলেও তখন পর্যন্ত হিন্দুদের হাতেই ছিল। গুজরাটের উপকূলভাগ অংশতঃ আমেদাবাদের রাজাদের দখলে থাকিলেও গুজরাট নৃপতি মামুদ বেগারা সম্প্রতি জুনাগড় বিজয়ের সুবাদে পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দিউর দক্ষিণে অবশ্য ইহাদের আধিপত্য ছিল না এবং গুজরাটের দক্ষিণ উপকূল হইতে পশ্চিমে কাথিয়াবাড়ের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এলাকা হিন্দুদের হাতেই ছিল, কেননা এই অঞ্চলেই ছিল তাহাদের পবিত্রতম কয়েকটি তীর্থ।

॥ ২ ॥

বর্ধমান ছাড়িয়া চৈতন্য ও গোবিন্দ দামোদরের পারে একটি গ্রামে কাশী মিত্রের আতিথেয়তা গ্রহণ করিলেন। এ অঞ্চলে এখনও কিছু সংখ্যক মিত্র পরিবার আছেন যাঁহাদের ধর্মই হইল ব্রাহ্মণ ও অভ্যাগতদের সেবা করা। দামোদরের পারে 'নাথু'র মিত্ররা আতিথেয়তাকেই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন।

তাঁহারা অতিথিমাত্রকেই আশ্রয়দান করেন এবং সাধ্যানুসারে অতিথির সেবাযত্নের কোন ত্রুটি রাখেন না। বলা যায়, চারিশত বৎসর কাটিয়া গেলেও, এখনও দামোদরের পারবর্তী অঞ্চলে কাশীমিত্রের আত্মিক প্রভাব আজও অতিশয় জীবন্ত।

এখান হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া গোবিন্দ হাজীপুরে আসিলেন। কাঁসাই নদীর তীরে মেদিনীপুর এখনও জিলা শহর। সেকালে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস আমরা তেমন কিছু জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে উড়িয়া, হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান রাজন্যবর্গের যুদ্ধের সময় এই স্থানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মেদিনীপুরের পরবর্তী স্থলটি নারায়ণগড। সৌভাগ্যবশতঃ এখানকার ইতিহাস যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্থলটি ছিল বাংলা ও উড়িষ্যার সীমানায়। ইহার উপর দিয়াই পুরী যাইতে হইত। নারায়ণগডের রাজাকে সম্রাটও খাতির করিয়া চলিতেন।·· ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' গ্রন্থে আছে, ওই বিখ্যাত রাজপুত সেনাপতি যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া এই পথেই পুরী হইয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। তখনও নারায়ণগডের রাজার অনুমতি দরকার হইয়াছিল।

নারায়ণগড়ের পর সুবর্ণরেখার পারে জলেশ্বর। জলেশ্বরের কয়েক মাইল পরেই সুবর্ণরেখা বাঁক ঘুরিয়াছে। এইখানে চৈতন্য নদীপার হইলেন।

করচায় উল্লেখিত পরবর্তী স্থলটি হরিহরপুর—সেকালে ব্যবসাবাণিজ্যের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। একশ বছরের কিছু পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে প্রথম কুঠি নির্মাণ করে। স্টুয়ার্ট ও মার্শম্যানের মতে উড়িষ্যার প্রথম কুঠিটি পিপ্‌লাইতে স্থাপিত হয়। কিন্তু সি. আর. উইলসন কোম্পানীর পুরাতন নথিপত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম কুঠিটি পিপলাইতে ছিল না, ছিল বালেশ্বরের নিকটবর্তী হরিহরপুরে। অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থেও হরিহরপুরের উল্লেখ আছে।

চৈতন্যের উদ্দেশ্য ছিল তীর্থযাত্রা, কেবল দেশভ্রমণ নয়। এই কারণে বালেশ্বর হইতে তিনি পশ্চিমে নীলঘেরি পর্বতের দিকে চলিলেন এবং নীলগড শহরে বৈষ্ণবতীর্থ দেখিতে গেলেন। নীলগডের পর তিনি বৈতরণী পার হইলেন। পরদিন মহানদী পার হইয়া কটকে পৌছিলেন। করচায় কটকের উল্লেখ নাই। কিন্তু গোবিন্দ কটকের নিকটবর্তী গোপীনাথ ও সাক্ষীগোপালের উল্লেখ করিয়াছেন। কটকের নিকটবর্তী রেমুণা নামক স্থানে সাক্ষীগোপালের মন্দির অবস্থিত।

কটক হইতে পুরী প্রায় ৩০ মাইল। এই পথে দুইটি স্থল চৈতন্যকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। একটি নিংরাজ মন্দির, অপরটি আঠারনালা। আঠারনালায় পুরী জেলার সীমানায় আঠারটি পরিখা আছে, এই স্থল হইতে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

সাধারণের বিশ্বাস, পুরীর মন্দিরটি তৈরী হয় অনঙ্গভীমদেবের আমলে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু ও মনোমোহন চক্রবর্তীর গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বিখ্যাত মন্দিরটি কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গদেবের উড়িষ্যা বিজয়ের কীর্তিসৌধ—এই জয় হইয়াছিল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। চোড়গঙ্গ ছিলেন কর্ণাটের গঙ্গ বা

কঙ্ক বংশের সন্তান। নবম শতাব্দীতে গঙ্গরা কর্ণাটক বা পশ্চিম মহীশূর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কলিঙ্গ দেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলে, কলিঙ্গপত্তন হয় ইহার রাজধানী। কালক্রমে উড়িষ্যার কেশরী বংশের দুর্বলতার সুযোগে চোড়গঙ্গ উড়িষ্যা জয় করেন এবং জয়ের স্মারকরূপে পুরীতে একটি মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরটি এখনও আছে। ইহাই বর্তমানে জগন্নাথদেবের মন্দির। অনঙ্গভীমদেব মন্দিরটি বড় করেন এবং জগমোহন বা নাটমন্দিরটি স্থাপন করেন।··

চৈতন্য তীর্থযাত্রায় বাহির হইলে ভক্তগণ পুরীমন্দিরের দশ মাইল দক্ষিণে আলালনাথের মন্দির পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই মন্দিরটিও বিষ্ণুমন্দির, ইহা শ্রীক্ষেত্র জিলার দক্ষিণ সীমানা।···পুরীতে যাঁহারা তীর্থ করিতে আসেন, আলালনাথের মন্দিরও তাঁহাদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। গোবিন্দ আলালনাথ হইতে গোদাবরী পর্যন্ত চৈতন্যের যাত্রাপথের কোন বিবরণ দেন নাই। গোদাবরীর তীরে চৈতন্য রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর হইতে সিন্ধুনদের মুখ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উপকূলভাগ ছিল হিন্দুরাজাদের অধিকারে। চৈতন্য এই উপকূল বরাবর পুরী হইতে দ্বারকায় যান, তারপর আড়াআড়িভাবে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই গ্রন্থ হইতে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, পুনা শহর মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে বিখ্যাত হইবার বহুপূর্বেই, গ্রন্থকার পুনার বর্ণনা দিয়াছেন সংস্কৃত শিক্ষার বিরাট কেন্দ্র রূপে; সেকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে এখানে আসিয়া ভীড় করিতেন এবং এ স্থানের ব্রাহ্মণেরা গীতা ভাগবতের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। সেকালের পুনার এক পণ্ডিত, নাম তুন্ড্; চৈতন্যের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল—তিনি সহ্যাদ্রি ও কোঙ্কনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জ্ঞাপন করিলেন। সহ্যাদ্রির সৌন্দর্য ও মহিমা এ গ্রন্থে বড় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এ গ্রন্থে চৈতন্য কর্তৃক দুইজন দস্যু উদ্ধারের চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। এই দস্যুদের একজন নারোজী ব্রাহ্মণ, অপরজন পন্থ ভীল। নারোজী তাহার দলবল লইয়া কোঙ্কণের জঙ্গলে, এবং পন্থভীল দ্রাবিড়দেশে বাস করিত। উভয়ে নিজনিজ কৃতকর্মে অনুতপ্ত হইয়া বৈষ্ণব হইল। নারোজী চৈতন্যের সহিত গুজরাটে আসিল এবং চৈতন্যের সম্মুখে দেহত্যাগ করিল।

গুজরাটের মুসলমান রাজত্বে রাজধানী আমেদাবাদ ছিল বিখ্যাত শহর। শহরের চারিধারে নানা উদ্যান ও ধনীদের গ্রীষ্মাবাস ছিল। 'আশ্চর্য আমেদাবাদ জাঁকের শহর। কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর'॥ চৈতন্য আমেদাবাদ পৌছিয়া নন্দিনী নামক উদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন।

আমেদাবাদ ছাড়াইয়া অরণ্যস্থলীতে কুলীনগ্রামের রামানন্দের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। 'রামানন্দ বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান, তাঁহার পিতামহ ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় শ্রীমদ্ভাগবতের আংশিক পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

আমেদাবাদ হইতে তাঁহারা সোমনাথ আসিলেন। 'চিবিচাবা ভাঙ্গা চিহ্ন আছে সেইখানে। দেখিয়া আঘাত বড় লাগিল পরাণে॥ মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া। ইহা দেখি প্রভু মোর আকুল কাঁদিয়া'॥—গজনীর মামুদ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করার পর গুজরাটের চালুক্যরাজ ভীম উহা পুনরায় নির্মাণ করেন। কিন্তু মুজফ্‌ফর শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মুজফ্ফর মন্দিরটি আবার ধ্বংস করেন। এ ঘটনা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের। এই বংশের রাজত্বকালে উহা পুনর্নির্মিত হয় নাই। চৈতন্য যখন এখানে আসিলেন, তখন এখানে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী মহম্মদ শা বেগারার রাজত্ব চলিতেছে! চম্পানগর ও জুনাগড় জয় করিয়া তিনি গুজরাটে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস করেন। সোমনাথের বর্তমান মন্দির তৈরী হয় মোঘল আমলে।···

দ্বারকা হইতে পুরী ফিরিবার পথে চৈতন্য গণ্ডোয়ানার বনপথ ধরিয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমঝোরা, মাণ্ডালা, দেওঘর, চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর, স্বর্ণগড়, সম্বলপুর, দাসপাল এবং অন্যান্য স্থান পার হইয়া আসেন। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশ স্থল তখন পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, কতকগুলি কখনই মুসলমানের পদানত হয় নাই।

আকর: 1. *Govindadaser Karacha*, Vernacular Literature: The Calcutta Reviw, October, 1895

2. *The Diary of Govinda Das*, The Calcutta Review, January & April, 1898

3. *The Topography of Govinda Das's Diary*, The Calcutta Review, July, 1898

মহাপ্রভু প্রসঙ্গে

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪২-৯৯)

··যদি সত্যপ্রেম জন্মে, তবে আপনা হইতেই প্রাণ শান্ত হইবে। যদি আমি 'পরমেশ্বর' 'পরমেশ্বর' বলি, নাচি কুঁদি, কিন্তু পরস্ত্রীকে কুভাবে দর্শন করি, মিথ্যা বলি, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া বেড়াই, তবে আমি এখনও তাঁকে চিনিতে পারি নাই, আমার ভালবাসা পাপে। একটুকু প্রেম হইলে, আর কি পাপ থাকে? সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, সত্য-সত্য প্রেম হইলে আর পাপ থাকে না। যখন মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে নাম দিলেন, তখনই তাঁহাদের পাপবোধ হইল—প্রাণে গভীর জ্বালা উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভু! পাপের জ্বালা তো যায় না"। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা খেয়াঘাটে যাও, তথায় যত লোক পার হইবে, তাহাদের পদধূলি গ্রহণ কর, ইহাতেই তোমাদের জ্বালা দূর হইয়া যাইবে।" যতদিন পাপের জ্বালা না হয়, ততদিন আমরা রিপুর পূজা করিয়া থাকি, এতে পরমেশ্বরের পূজা হয় না।··

মহাপ্রভু, যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই সময়ে তথাকার এক রাজা, তাঁহার যৌবনকাল ও রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি কখনও সন্ন্যাসীর ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারেনা, কেবল কপটতা করিতেছে। তিনি ইহা ভাবিয়া পরীক্ষার জন্য এক রূপবতী বেশ্যাকে মহাপ্রভুর ধর্মবিনাশের জন্য প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু যখন সমুদ্রতীরে, গভীব ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, সেই সুন্দরতম পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আছেন, এরূপ সময়ে ঐ বেশ্যা যাইয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাব গাত্রে হস্তার্পণ করিল। স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শ হওয়াতে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু তখনও তিনি একবার চক্ষু মেলিতেছেন, বারবার চক্ষু বুজিতেছেন, কখনও দেখিতেছেন সেই সুন্দরতম প্রিয়তমের নিকটেই আছি, কখনও ভাবিতেছেন, এ কোথায় আসিলাম? এরূপ করিতে করিতে নিকটে একটি স্ত্রীলোক রহিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। মনে করিলেন মাতা শচী, বুঝি আমায় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি ঐ বেশ্যার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 'মা', 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ বেশ্যার স্তনধারণ করিয়া স্তনপান করিতে লাগিলেন। বেশ্যা, তাঁহার এইভাব দর্শন করিয়া, তাঁহার সংস্পর্শে মোহিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার মা নহি, আমি অতি দুশ্চারিণী পাপীয়সী, তোমার ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম ; যা হউক, আমাকে উদ্ধার কর, নচেৎ অন্যগতি নাই।" তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমার সর্বস্ব দান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া এসো", পরে তাহাকে দীক্ষিত করিলেন। কিয়ৎদিনের মধ্যেই সেই বেশ্যা পরমভক্ত হইয়া বিখ্যাত হইলেন।

বস্তুতঃ যতদিন সেই সুন্দরতমের দর্শন না হয়, ততদিন লোক প্রলোভনে পতিত হয়। একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর কি মন অন্যদিকে ফিরিতে পারে? তখন ইচ্ছা করিয়াও আর পাপে যাওয়া যায় না, লোকে পাপবিষয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাঁহার সৌন্দর্য বর্ণনার কোন ভাষা নাই, কোন উপমা নাই। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্রতারা, ফুল ফল, এ সকল সুন্দর পদার্থ দেখিয়া আমরা ইহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকি,—ইহা মিথ্যা, অসারের অসার; সে সৌন্দর্যের কণামাত্র ইহাতে প্রকাশ পায় না; সে স্বতন্ত্র অন্যবিধ পদার্থ; সেই পদার্থ সকলের প্রাণেই আছে, একটুকু আড়াল ভাঙ্গিলেই দেখা যায়।

আকর: 'প্রভুপাদ শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ'. ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা।

ইলোরায় শ্রীগৌরাঙ্গ

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)

সৌরাষ্ট্রে প্রভু যে-বটবৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও লোকেরা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটি প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম,—

"শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। এইস্থান অতি দুর্গম, বোম্বাই হইতে কয়েক দিবস দূরে। রামযাদববাবু কষ্টে সৃষ্টে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। এখানে আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি দেখিতেছেন যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোলকরতাল লইয়া কয়েকজন ঐ দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। 'আমাদের সংকীর্তন' বলার তাৎপর্য এই যে, যদিও সে সংকীর্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার আকৃতি ঠিক আমাদের সংকীর্তনের মত। রামযাদববাবু আশ্চর্যান্বিত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় সেই কীর্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদূরে, আমাদের সংকীর্তন আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কুমারটির নাম কিরূপে আসিল?—ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামযাদববাবু বিভোর হইলেন।

কীর্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রামযাদববাবুর এই সঙ্কল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে রহিয়া গেলেন, ও দুই দিবসের অনুসন্ধানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণবের দর্শন পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশ, সেই বঙ্গদেশে হইতে এই খোল করতাল ও কীর্তন আসিয়াছে।" কিরূপে আসিল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন।"

পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা ও সে তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে! একবার এই বিষয়টি অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু।

আকর: শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত, তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীচৈতন্যের স্বকৃত রচনা

ড. সুশীল কুমার দে

বঙ্গদেশে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মকে চৈতন্য-নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ; কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্যদের মত চৈতন্যও ধর্মদর্শনের কোন গ্রন্থ লিখেছিলেন কিনা তা কখনো খতিয়ে দেখা হয় নি। চৈতন্যভক্তরা স্বভাবত কল্পনা করতে ভালবাসেন যে চূড়ান্ত বিদ্যাবত্তার গৌরব ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর অধিগত হয়েছিল। অন্ততঃ একজন প্রাচীন চৈতন্যচরিতকার—যিনি ছিলেন এক উঁচুদরের তাত্ত্বিক পণ্ডিত—চৈতন্য মুখে শুনিয়েছেন দীর্ঘ দার্শনিক আলোচনা, চিত্তচমৎকারী ভাষ্য এবং ধর্মসম্প্রদায়ের বিশদ তত্ত্বকথা, যদিও ওই চরিতকাব্যেই চৈতন্যের ক্রমবর্ধমান ভাবাবেশ ও ভাববিহ্বলতার যে দশা চিত্রিত হয়েছে তার সঙ্গে শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের মূর্তি মোটেই খাপ খায় না।

ছেলেবেলা থেকেই নাকি চৈতন্যের বয়স ছাড়া বুদ্ধি দেখা গিয়েছিল। আর পনের বছর বয়সেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বলা হয়েছে যে বালক চৈতন্যকে টোলে পাঠাতেই চাননি তাঁর বাবা-মা—তাঁদের ভয় ছিল এই ছেলেও তার দাদা বিশ্বরূপের মত পড়াশুনো শিখে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়! ইচ্ছাসুখে থাকতে থাকতে নিমাই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। পরে অবশ্য তাকে বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শনের পাঠশালায় পড়িয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গঙ্গাদাসের টোলে পাঠানো হয়েছিল। ব্যাকরণের পণ্ডিত হিসাবেই গঙ্গাদাসের খ্যাতি ছিল। হতে পারে ছেলেবেলায় চৈতন্যের মধ্যে সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু একজন মস্ত পণ্ডিত হবার আগ্রহ তাঁর ছিল কিনা সন্দেহ ; এভাবে তাঁকে চিত্রিত করাও নিরর্থক, কেননা তাঁর প্রকৃত মহিমা ছিল অন্যত্র। নবদ্বীপের মত বিদ্যাচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে একটি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বালকের যে শিক্ষা হতে পারে, সম্ভবত সেই শিক্ষাই তাঁর হয়েছিল, তবে মনে হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশেষত কলাপ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র—এতেই তাঁর পড়াশোনা সীমাবদ্ধ ছিল। চরিত গ্রন্থগুলিতে এরই উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন (চৈতন্য ভাগবত, আদি ৭) যে, চৈতন্যের শিক্ষক গঙ্গাদাস ছিলেন 'ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিদ' চৈতন্যের ব্যাকরণ পঠন পাঠনের একাধিক উল্লেখ করেছেন তিনি। যেমন, দিগ্বিজয়ী (কেশব কাশ্মীরী) তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছেন, 'শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায় ব্রাহ্মণ' (চৈ. ভা. আদি ১১), 'ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াও কলাপ' (চৈতন্য চরিতামৃত, আদি ১৬৷৩২-৩৫)। চৈতন্য নিজেও তা নিয়ে গর্ব করেছেন—'প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি' (তদেব)। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলেও কলাপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া চৈতন্য নাকি নিজেই

স্বীকার করেছেন যে অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁর তেমন ভাবে পড়া হয় নি ('নাহি পঢ়ি অলঙ্কার করেছি শ্রবণ'—চৈ. চ. আদি ১৬।৫২)। অথচ কেশব কাশ্মীরীর সঙ্গে তাঁর যে তর্কযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তাতে অলঙ্কার শাস্ত্রের ওই ভাসা-ভাসা জ্ঞানের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে।

নবদ্বীপ সেকালে, এবং একালেও, নব্য ন্যায়চর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ হলেও বিশ্বম্ভর (চৈতন্যের প্রাক্‌সন্ন্যাস নাম) এই বিষয়টি পড়েছেন—এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং একথা বলা হয়েছে যে নবদ্বীপের লোকেরা তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বলেছে তিনি ন্যায় পড়লে একজন 'ভট্টাচার্য্য' হতে পারতেন—'কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ ন্যায় যদি পড়ে। ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখন না নড়ে॥' (চৈতন্য ভাগবত, আদি ১১)।

চৈতন্য তাঁর ভক্তি ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। কোন বিশেষ মতবাদ বা সম্প্রদায় গড়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। · পরবর্তী কালে যে বিশেষ ধর্মমত ও সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, তা হয়েছে প্রধানত তাঁর পার্ষদ ও শিষ্যদের চেষ্টায়। ·· অনুগামীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল প্রধানত অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের উপর, এ ব্যাপারে চৈতন্য নিজে সক্রিয় হতে পারেন নি, এ বিষয়ে বিস্তারিত চিন্তাভাবনা করা বা লেখার দায়িত্ব নেবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। অল্পবয়সে তাঁব মেধার যে গর্ব ছিল, গয়া থেকে ফেরার পর তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না—পাণ্ডিত্যকে তিনি বর্জন করেছিলেন। অধ্যাত্ম-অনুভবের গভীরতায় তিনি নিমগ্ন হয়ে থাকতেন, তাই দার্শনিক আলোচনা করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। কোন কোন চৈতন্যচরিতে তাঁকে নিপুণ তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হিসাবে দেখান হলেও (একটি স্থলে দেখান হয়েছে চৈতন্য একটি শ্লোকের ৬১ রকম পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন) ওই সব গ্রন্থেই দেখানো হয়েছে, দিব্য ভাবের উন্মাদনায় তিনি শাস্ত্র বিধি মেনে চলতে পারতেন না। যে-সব ধর্মতত্ত্ব তাঁকে দিয়ে বলানো হয়েছে, তা পরবর্তীকালের, এবং চরিতকারেরা নিজেরাই ওই সব তত্ত্বের কঠোর অনুশীলন করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, নতুন আবিষ্কৃত ব্রহ্ম সংহিতা এবং বিল্বমঙ্গল, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডী দাসের ভক্তিগীতি ছাড়া আর কিছু তিনি পড়তেন বলে মনে হয় না। তাত্ত্বিক পণ্ডিতের মিথ্যা গৌরবে তাঁকে ভূষিত করার চেষ্টার মধ্যে আছে ভ্রান্ত উৎসাহ ; তার প্রকৃত মহত্ত্ব ছিল অন্যত্র, মানুষকে যে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন, তা-ও পাণ্ডিত্য দিয়ে নয়, অন্যভাবে।

সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে 'শিক্ষাষ্টক' বা সংস্কৃতে আটটি শ্লোক ছাড়া চৈতন্য আর কিছু লেখেন নি। এই শ্লোকগুলিতে তাঁর ভাবাবেশের সরল প্রকাশ ঘটেছে। চৈতন্য পার্ষদ রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীতে তাঁর নামে ('শ্রীভগবতঃ' রূপে উল্লেখিত) আটটি শ্লোকই সংকলিত হয়েছে।··· প্রবোধানন্দের 'চৈতন্য চন্দ্রামৃত'-এর টীকায় আনন্দি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে চৈতন্য কখনও কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে, গ্রন্থরচনা ছাড়া ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার সম্ভব নয়—একথার বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন, চৈতন্য কোন গ্রন্থরচনা না করলেও রূপপ্রমুখ শিষ্যদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে ভক্তিতত্ত্ব প্রচারে তিনি তাদের উৎসাহিত করেছিলেন।—'ন চ গ্রন্থাদি-রচনাংবিনা লীলাদিবিস্তারণং ন স্যাৎ।. গ্রন্থাদিঃ কোঽপি ন কৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন কথং তদ্বস্তুপ্রথনমিতিবাচ্যং। ভগবতা সাক্ষাৎ গ্রন্থকরণাভাবাৎ হৃদা ব্রহ্মণি ব্রহ্ম প্রকাশিতবৎ শ্রীরূপাদিষু স্বেষু হৃদিশক্তিং সঞ্চার্য্য তত্তদ্দ্বারেণ সর্ব্বং প্রকাশিতমিতি'—[১২২ শ্লোকটীকা]।

সুতরাং, চৈতন্যকে কোন বিশেষ গ্রন্থের বা কোন বিশেষ তত্ত্বের রচয়িতা বলে প্রচার করার পিছনে সঠিক কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাঁকে দিয়ে যে বিশদ ধর্মতত্ত্ব বলানো হয়েছে, তা সত্যই কতটুকু তিনি বলেছিলেন তা নির্ণয় করা বাস্তবিক দুরূহ, কেননা তাঁর উক্তি বলে প্রচারিত এইসব তত্ত্বকথা আসলে ষড়গোস্বামীর উচ্চপাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্তসার মাত্র। পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত এইসব ধর্মতত্ত্বে চৈতন্যের মতাদর্শ কতটা প্রতিফলিত হয়েছে—সে সম্পর্কে কোন ধারণা করা কঠিন। একথা ঠিক যে কৃষ্ণদাস বলেছেন, চৈতন্যই সনাতন ও রূপগোস্বামীকে সম্প্রদায়ের তত্ত্বভিত্তিরূপে এই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনার আদেশ দেন এবং বিস্তারিত পরিকল্পনাও ছকে দেন। কিন্তু এই ছকের সঙ্গে অনেক পববর্তীকালে রচিত গোস্বামীদের গ্রন্থের বিষয়বস্তুর এত পুঙ্খানুপুঙ্খ মিল যে, কৃষ্ণদাসের মূল বক্তব্যের ভিত্তিই আলগা হয়ে পড়ে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, গোস্বামীরা চৈতন্য ও তাঁর জীবনকর্মের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে স্বীকৃতি জানালেও কোথাও বলেননি যে, চৈতন্যনির্দেশ ও চৈতন্যপরিকল্পনা অনুসারে তাঁরা এইসব গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সনাতন গোস্বামী তাঁর বৃহদ্ভাগবতামৃতের একাদশ শ্লোকে বলেছেন: ভগবদ্‌ভক্তি শাস্ত্রানাময়ং সারস্য সংগ্রহঃ
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ

এখানে 'অনুভূতস্য' শব্দটির প্রয়োগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সনাতন কোথাও বলছেন না যে তিনি ভক্তিশাস্ত্র রচনায় চৈতন্যের নিকট প্রত্যক্ষভাবে কোন শিক্ষা পেয়েছেন; তাঁর বক্তব্য—চৈতন্যের মধ্যে ভক্তির যে লীলাবৈচিত্র্য তিনি অনুভব করেছেন, তা-ই তিনি এখানে গ্রথিত করেছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতের স্বকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকায় সনাতন বলেছেন: স্বয়ং প্রবর্ত্তিতৈঃ কৃৎস্নৈর্মমৈতল্লিখনশ্রমঃ

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপোঽসৌ ভগবান্ প্রীয়তাং সদা।

এতে অবশ্য চৈতন্যপ্রেরণালাভের কথা (হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাক-রূপোঽপি) বলা হয়েছে; কিন্তু ষড়গোস্বামীর গ্রন্থরাজির মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ চৈতন্যশিক্ষার কোন স্বীকৃতি নেই—কৃষ্ণদাস কবিরাজের বক্তব্যের কোন সমর্থন নেই। কৃষ্ণদাসের ওই ধারণা সত্য হলে, ষড়গোস্বামী এবিষয়ে অবশ্যই নীরব থাকতেন না। 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হয়েছে, চৈতন্যসাক্ষাৎকারের আগেই রূপসনাতনের যথেষ্ট বয়স

হয়েছিল এবং তাঁরা বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগীও হয়েছিলেন ; সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব বিধিবদ্ধ করার জন্য চৈতন্য যে তাঁদের বেছে নিয়েছিলেন, তার অন্যতম কারণ ছিল এই।

প্রকৃতপক্ষে রূপসনাতন মহাপ্রভুর সঙ্গ খুব অল্পকালের জন্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবের সে সৌভাগ্য হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। অল্প কয়েক-মাস মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁরা কাটিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের কথা মানতে হলে বলতে হবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই, গোস্বামীদের বিরাট বিরাট গ্রন্থে ভক্তিশাস্ত্রের গভীর ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে তাত্ত্বিক উপস্থাপনা করা হয়েছে, সে-সব কিছুই চৈতন্য তাঁদের ধরে ধরে শিখিয়েছিলেন। একথা বিশ্বাস করা কঠিন, কেননা গোস্বামীদের গ্রন্থরচনার পিছে সারাজীবনের স্বাধ্যায়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

তাত্ত্বিক ও দার্শনিক গোস্বামীদের গ্রন্থে প্রাচীন শাস্ত্রানুসারী কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টিতে কৃষ্ণ অবতার নন, পরমেশ্বর স্বয়ং। চৈতন্যলীলা সম্পর্কে তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ নীরব এবং তাঁদের পরিকল্পিত ভক্তিতত্ত্বকাঠামোয় চৈতন্যের স্থান কোথায়—সে সম্পর্কেও তারা নীরব। চৈতন্যের নামে কোন তত্ত্বদর্শন গড়ে তুলতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রাচীনতর শাস্ত্রীয় উপাদানের উপর নির্ভর করলেন, চৈতন্যের জীবনে যে অধ্যাত্মসত্য পরিস্ফুট হয়েছিল, তার সরাসরি উল্লেখ একবারও করলেন না—এটা একটু অদ্ভুত লাগে। উপাস্যদেবতারূপে কৃষ্ণের দেবত্ব তারা বিশদ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু নমস্ক্রিয়া ও বিবিধ ভক্তিস্তোত্রে চৈতন্যের দেবত্বের আভাস মিললেও, সেই দেবত্ব নিয়ে আলোচনা হয় নি বললেই চলে।

সে যাই হোক মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তকদের মত চৈতন্য নিজে কোন ধর্মীয় বা দার্শনিক গ্রন্থরচনায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি অথবা নিজের ধর্মাচরণ বা শিক্ষণ ধারা সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করার কোন ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। রূপগোস্বামীর পদাবলীতে (২২, ৩১, ৩২, ৭১, ৯৩, ৯৪, ৩২৪ ও ৩৩৭ সংখ্যক) যে আটটি শ্লোক তাঁর রচনারূপে সংকলিত হয়েছে, একমাত্র সেইগুলিই তাঁর রচনা বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই আটটি শ্লোকের নাম দিয়েছেন 'শিক্ষাষ্টক' (চৈ. চ. অন্ত্য ২০/৬৪-৬৫) এবং বলেছেন :

পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিলা।
সেহ অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিলা॥

'চৈতন্যচরিতামৃতে' চৈতন্য পুরীতে স্বরূপ আর রামানন্দের নিকট এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু উক্ত বিবৃতিতে 'পূর্বে' শব্দটির ইঙ্গিত কি এই নয় যে এগুলি অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল ? এই অনুমান সত্য হলে, রূপ গোস্বামীর অন্যান্য গ্রন্থের মত পদ্যাবলীতে চৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া নেই কেন, তার একটা ব্যাখ্যা মেলে। নমস্ক্রিয়া নেই, অথচ প্রতিটি শ্লোকের রচয়িতা 'শ্রীভগবৎ'। সম্ভবতঃ রূপ-গোস্বামী চৈতন্যশিষ্য হবার অনেক পূর্বেই রামকেলিতে বসে সংকলন আরম্ভ করেছিলেন এবং রামকেলি ছেড়ে চৈতন্য আশ্রয় নেবার আগে সংকলন সমাধা করেছিলেন। ছাত্রনবদ্বীপে বাসকালেই চৈতন্য এই শ্লোকগুলি বন্দনা করেছিলেন এবং রূপগোস্বামী

সেগুলি সংগ্রহ করে তাঁর বৈষ্ণবীয় শ্লোকের সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত করেছিলেন। সম্মান সূচক 'শ্রীভগবতঃ' অভিধাটি প্রয়োগ সে সময়ে অসম্ভব ছিল না ; কেননা নবদ্বীপ বাসকালেই চৈতন্যের দেবত্বে অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেও বলা হয়েছে, চৈতন্য-শিষ্য হবার আগেই রূপ গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ওই সময়ই নবদ্বীপের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলির প্রামাণিকতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটিকে বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী'তে জনৈক মধুসূদনের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে রূপগোস্বামীর সাক্ষ্যের মূল্য নিশ্চয় অনেক বেশী।

পদ্যাবলীতে পর পর যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ক্রম বজায় রেখে 'শিক্ষাষ্টকে'-এর আটটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হল :

চেতোদর্পণ মার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্ ॥১

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তিঃ
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা!
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ—
স্থিত ধূলি সদৃশং বিভাবয় ॥৪

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা!
পুলকৈর্নিচিতঃ বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৫

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৬

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং!

শূন্যায়িতং জগত্যাপি গোবিন্দ বিরহেণ মে !!৭

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা !
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ !!৮

এই শ্লোকগুলিতে গভীর ও ঐকান্তিক ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে বিশেষ কোন তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা নিরর্থক।

কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃতে চৈতন্য অন্য কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেছেন কিন্তু সেগুলি তাঁরই রচনা কিনা সঠিক বোঝা যায় না। যেমন,

অম্বুজম্বুনি জাতং কচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু !
মুরভিদি তু বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা !! আদি।১৬।৮২

মধ্য।১।২১১ সংখ্যক শ্লোকটি রূপকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন চৈতন্য, কিন্তু এ শ্লোকটির উৎস 'পঞ্চদশী' :

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি !
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গরসায়নম্ !! (৯।৮৪)

আরেকটি শ্লোক আবৃত্তি করেছেন চৈতন্য (অন্ত্য ৬।২৮৫)—এতে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-প্রত্যাশার সমালোচনা করা হয়েছে :

অয়মাগচ্ছত্যয়ং দাস্যত্যনেন দত্তময়মপরঃ !
সমেত্যয়ং দাস্যত্যনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি !!

চৈতন্য মুখোদ্গত আরেকটি শ্লোক—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরোঽপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরাং প্রকাশিতুং !
বংশী বিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা !! মধ্য ২।৪৫

চৈতন্য ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধ চৈতন্য আবৃত্তি করেছেন :

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপাল মূর্তিঃ।

.. এছাড়া স্তোত্র ধরণের কতকগুলি রচনা চৈতন্যের নামে চালানো হয়, কিন্তু কোনটিরই প্রামাণিকতা নিঃসন্দিগ্ধ নয়।

আকর : Vaisnava Faith & Movement in Bengal :
Studies in Bengal Vaisnavism

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭)

রাজকার্যের অনুরোধে বহু বৎসর হইল আমি উৎকলদেশে প্রবাস করিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এই দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, শতগুণে তদবস্থার সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যাধ্যাপনা প্রচুর রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুগভীর সুনিবিড় তিমিরময় গিরিগহ্বরে সূর্যরশ্মির প্রবেশবৎ উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইয়াছে।·· অত্রত্য লোকের পূর্ব কীর্তিকলাপ দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, উৎকলীয় লোকের মানসে অনেকগুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে এবং তাহারা একসময়ে বীরত্ব ও ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রতিবেশিতা সম্পর্কবশতঃ বহুকাল পর্যন্ত সুপরিচয় আছে। বঙ্গদেশের শেষ অধিপতি মুসলমান অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবাব জন্য এই দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক বিপ্রকুলতিলক বিশ্বম্ভর মিশ্র যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পশ্চাৎ পরিব্রাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন, তিনি এই উৎকলদেশেই আপনার মত প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মকে এককালে এদেশ হইতে নিষ্কাশিত করেন। বলিতে কি, এক্ষণে উৎকলেব তৃতীয়াংশ লোক তাঁহারই মতাবলম্বী, তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকে ।

প্রায় ৩৭০ বৎসর অতীত হইল, যখন চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে স্বীয়মত প্রচার করেন, সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও প্রথমে তন্মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল কারণবশতঃ বোধহয় শঙ্করাচার্য রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম প্রসক্ত উৎকলীয় দিগকে হিন্দুধর্মে পুনরানয়ন কল্পে এক বিশেষ কৌশলপরায়ণ হইয়াছিলেন , তাঁহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধমত বোধিদ্রুমকে সমূলে উৎপাটন না করিয়া তাহার অতিরিক্ত পল্লবাদি ছেদন করিয়া সনাতন ধর্মতরুর আকাবে তাহাকে পরিণত করিয়া থাকিবেন। বেদপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবধর্মে হিংসা অর্থাৎ পশুচ্ছেদন পূর্বক বলির বিধান আছে। রামানন্দ, রামানুজ বা চৈতন্যমতে তাহার নিষেধ—পক্ষান্তরে, অহিংসাই বৌদ্ধধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য বা উপদেশ—ইহাতেও উল্লিখিত কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

আকর : 'কাঞ্চী কাবেরী' (ভূমিকা ও পাদটীকা) কার্তিক, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

রামকৃষ্ণ কথামৃতে চৈতন্যকথা

গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২)

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌরনিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'। প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল 'আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই ; 'যুবতী মেয়ে' কিনা পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য।"

"সমাধিস্থ হবার পর, প্রায় শরীর থাকে না। কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেউ কেউ ঝুড়িকোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর।"

"অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্যলাভ হয়। তখন দেখে সর্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।"১

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়। আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হ'তো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো!

"চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গায়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন, কেননা হরিনামের কীর্তনের সময় খোল বাজে"।

"আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন সকলে প্রণাম করবে বলে, যারা একবার নমস্কার করবে তারা উদ্ধার হয়ে যাবে"।

(মাষ্টারের প্রতি) "দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।

যোগমায়ার এমনি মহিমা তিনি ভেল্‌কি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবনলীলায় যোগমায়া ভেল্‌কি লাগিয়ে দিলেন। তারই বলে সুবোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন ক'রে দিচ্ছ্‌লেন। যোগমায়া—যিনি আদ্যাশক্তি—তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।

(ছোকরা ভক্তদের প্রতি) তোরা ত্রৈলোক্যের সেই বইখানা পড়িস—ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা। তার কাছে একখানা চেয়ে নিস্‌না। বেশ চৈতন্যদেবের কথা আছে"।

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায় তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া।

চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন, দেখলেন একজন গীতা পড়ছে। আব একজন একটু দূরে বসে শুনছে—আর কাঁদছে কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব বুঝতে পারছো? সে বল্লে ঠাকুর! শ্লোক এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তবে কেন কাঁদছে? ভক্তটি বললে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি"।

"চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হতো—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হতেন, জড় সমাধির অবস্থা হতো। অর্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুশ থাকতো। বাহ্যদশায় নামগুণ কীর্তন করতে পারতেন।"

[গিরিশের প্রতি] "সেদিন তোমায় যা বললুম, ভক্তির মানে কি—না, কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়, অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা বা সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা কবা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব স্তুতি, তাঁর নামগুণ কীর্তন, এই সব করা।

কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তাঁর নামগুণ কীর্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাতহালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল বলে তাঁর ভজনা করে।"

"নিষ্ঠার পব ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বর কোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।"

"বৈষ্ণব শাক্ত সকলেরই পৌঁছিবার স্থান এক, তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শক্তির নিন্দা করে না।"

"কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আস্‌তো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো।

যখন লীলায় মন নেমে আসতো তখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা কবতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হতো রামলালাকে নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম, কখনও নাওয়াতাম, কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐরূপ সর্বদা দর্শন হতো। আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুইভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌবাঙ্গের রূপ দর্শন হ'তো।"

[বলরাম মন্দিরে]

"মাষ্টার আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'গৌর নিতাই তোমরা দুভাই'। ঠাকুরও ঐ গানটি

গাইতে বলিতেছেন। ত্রৈলোক্য ও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া গাইতেছেন,—'গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু'। ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটি ধরিলেন :

'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে কোল দেয়, তারা দু'ভাই এসেছে রে।

ঐ গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাইতেছেন—

'নদে টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে'।

ঠাকুর আবার ধরিলেন : 'কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায় ?
যারে মাধাই জেনে আয়।
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে।
যাদের সোনার নূপুর রাঙা পায়।
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা রে
যেন দেখি পাগলের প্রায়।

একটু আলাপের পর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, 'সেই গানটি আর একবার'। ত্রৈলোক্য গাইতেছেন : 'জয় শচীনন্দন, গৌরগুণাকর, প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর। দীনজন বান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর।'

'গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়'—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন,—একেবারে বাহ্যশূন্য।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ত্রৈলোক্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, 'একবার সেই গানটি! কি দেখিলাম রে'।

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন : 'কি দেখিলাম রে, কেশবভারতীর কুটিরে,
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে'।

গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন।"[২]

আকর : ১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২)
২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ (১৮৮২)

ধর্মস্থাপক ও ধর্মযাজক

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, যখন ধর্মের কলুষিত অবস্থায় কোন মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের সারমর্ম ব্যাখ্যা করিয়া সত্যধর্ম পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা পান, ধর্মযাজকেরা তাঁহার শত্রু হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, ধর্মের প্রকৃত মর্ম আচ্ছাদিত না হইলে, ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্মযাজকের স্বার্থের বিশেষ হানি হয়। অর্থ উপার্জন, রমণীসম্ভোগ, মানসঞ্চয় যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনও যথার্থ ধর্ম-উপদেশ দিতে পারে না।

প্রচারক প্রচার করেন যে, কেহ এমন হীন নাই, কেহ এমন নীচ নাই যে, ঈশ্বর তাহার উপাসনা গ্রহণ করেন না। দয়াময় ঈশ্বর সকলেরই পূজা গ্রহণ করেন। অকপট পূজাই তাঁহার অধিক প্রিয়। অকপট চিত্তে পূজা করিলেই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। জাতিতে বাধে না, স্থানে বাধে না, কালে বাধে না, সকল জাতি, সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, ভগবানের নাম লইবার অধিকারী। ইহা যে কেবল তিনি মুখে বলেন, তাহা নহে, ইহা তাঁহার উপলব্ধ কথা ;...পুষ্পের সৌরভে যেরূপ মধুমক্ষিকা আকর্ষিত হয়, সেইরূপ নির্মল জীবন সৌরভে শত শত ধর্ম-মধু-পিপাসু আকর্ষিত হইয়া, তাহার নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন।

. যাজকগুরুর শিষ্যের বৃত্তি অপহরণে বিশেষ ব্যাঘাত পড়ে। প্রচারকের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে থাকে। যে-শাস্ত্রের প্রতি জীবনে তাহার একবারও আস্থা জন্মে নাই, সেই শাস্ত্র হইতে বেদবিরুদ্ধ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সঞ্চয় করে ও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায় যে, প্রচারক কোন ধর্মবিরোধী অসুর, পাপ-পঙ্কে মানবকে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত, কলির সাহায্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রের অঙ্গে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রকে অসুর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্লোক প্রচার করিয়াছে। উপায় নাই, ব্যবসা যায়, অলস জীবনে গুরুগিরি একমাত্র ব্যবসা শিখিয়াছে ; শিষ্যালয় ভোজী জিহ্বাও রসাস্বাদী, উপায় কি আছে! প্রচারক ত্বরায় উৎসন্ন না যাইলে, যাজক গুরুর সর্বনাশ!

এ যাজকগুরু আবার তিন প্রকার—সকলেই বিত্তাপহারক। তবে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণের স্বরূপ বা শিবের স্বরূপ, রমণী মাত্রেই তাহার সেবিকা। তাহাকে শিব-ভাবে দেহ অর্পণে সেবা করিলে নারী ভগবতী হইবে ও কৃষ্ণভাবে সেবা করিলে রাধা হইবার সম্ভাবনা। মদ্য মাংস, ননী, ক্ষীর লইয়া এইরূপ গুরুগিরি চলিতেছিল, অকস্মাৎ কামিনী ত্যাগী, মুখে কিছু না বলিয়া দৃষ্টান্তে সমাজকে বুঝাইল যে, ঐ সকল কার্য্যের নাম ব্যভিচার। এখন অব্যভিচারী প্রচারকের দৃষ্টান্তে ভ্রম দূর হইল, সুতরাং যাজকগুরুর রাসলীলারও ব্যাঘাত পড়িল। আর এক সাটের যাজকগুরু—তাহারা

'মহামান্যিত',—তাহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া নাস্তিক। এই তিন সাম্প্রদায়িক গুরুই ধর্মসংস্থাপক প্রচারকের পরম শত্রু।

বঙ্গদেশে যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, তিনিও ধর্মযাজকের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। তাঁহাকে লইয়া কতরূপ ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল। উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে ত্রিপুরাসুরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। উপস্থিত দেখা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যাজকেরা যে ভাষায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল কটূক্তি করিতেন, চৈতন্য সম্প্রদায়ও, চৈতন্যদ্বেষী যাজক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, অবিকল সেইরূপ কটূক্তি রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। 'দেশ মজালে, দেশ উচ্ছন্ন গেল'—এ সকল কথা যেমন চৈতন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ উঠিতেছে। কিন্তু সত্যের শক্তি অনিবার্য্য,… এবং মহাপুরুষেরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহাদের আবির্ভাব নিষ্ফল নয়, তাহা যে অচিরে প্রতীয়মান হইবে, ইহাই বা কিরূপে জানিবে!

আকর: 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্র, ১৩ই বৈশাখ, ১৩০৮

অবতার বরিষ্ঠ

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

সমস্ত অবতারের মধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্য ছিলেন শ্রেষ্ঠতম।[১]

দার্শনিকপ্রবর শঙ্কর এসে দেখালেন বৌদ্ধধর্মের ও বেদান্তের সারবস্তুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তারপর এলেন উজ্জ্বলমেধা রামানুজ—তিনি ব্রাহ্মণ থেকে পারিয়া পর্যন্ত সকলের সামনে আধ্যাত্মিক উপাসনার উচ্চতম সোপানটি পর্যন্ত খুলে দিলেন। রামানুজের প্রভাব ছড়াল উত্তর ভারতেও, সেখানকার বড় বড় ধর্মীয় নেতা রামানুজের ধারাটি গ্রহণ করলেন, কিন্তু সে হল অনেক কাল পরে, মুসলমান শাসনকালে, উত্তর ভারতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আবির্ভূত এই অবতারদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হলেন চৈতন্য।[২]

বর্তমান ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। এক শ্রেণীর আদর্শ রামানুজ, অপরশ্রেণীর শঙ্করাচার্য। দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রবক্তা রামানুজকে সমস্ত দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ই অনুসরণ করেছে। যেমন দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মগুরু মধ্বমুনি। চৈতন্য মধ্বাচার্যের দর্শন গ্রহণ করলেন এবং বাংলাদেশে এই দর্শন প্রচার করলেন।[৩] সেই একবার বাংলাদেশ ধর্মবিষয়ে আলস্য-অবসাদ ঝেড়ে ফেলে সমগ্র ভারতের ধর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত হল।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে সারা ভারত জুড়ে। যেখানেই আছে ভক্তিমার্গ, সেখানেই তাঁর লীলার রসোপলব্ধি, তাঁর চর্চা ও অর্চনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমগ্র বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়েরই শাখা মাত্র।[৪]

উত্তর-ভারতীয় এই মহান্ ঋষি চৈতন্যের মধ্যে গোপীদের প্রেমোন্মাদনা মূর্ত হয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ, জন্মেছিলেন সেকালের এক পণ্ডিত পরিবারে, স্বয়ং ন্যায়ের অধ্যাপক ও তর্কযুদ্ধে নিপুণ—কেননা, ছেলেবেলা থেকে এই পাণ্ডিত্যকেই তিনি সবচেয়ে বড় বলে ভাবতে শিখেছিলেন,—অথচ কয়েকজন সত্যদ্রষ্টার কৃপায় তাঁর জীবনধারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। তর্কযুদ্ধ ও ন্যায়ের অধ্যাপনা ত্যাগ করে তিনি হলেন ভক্তিবাদের মহান্ শিক্ষকদের অন্যতম—ক্ষ্যাপা চৈতন্য। তাঁর ভক্তিধারা প্লাবিত করল সমগ্র বাংলাদেশকে, আশ্বাস দিল প্রতিটি মানুষকে। তাঁর ভালবাসা কোন বাঁধ মানল না। সাধু-পাপী, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্রাত্মা-হীনচেতা, বেশ্যা বা ভবঘুরে—সকলেই তাঁর ভালবাসার পাত্র, সকলেই তার করুণার অধিকারী, এবং আজ পর্যন্ত, কালধর্মে স্বাভাবিকভাবে অধঃপতিত হয়েও, তাঁর ধর্ম সম্প্রদায়ই ঠাঁই দেয় তাদের যারা গরীব, যারা নিপীড়িত, যারা জাতিচ্যুত দুর্বল, সমাজ যাদের ঠাঁই দেয় না।[৫]

এটা বেশ লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীচৈতন্য ভারতীগুরুর নিকট সন্ন্যাস নিয়ে 'ভারতী' হলেও মাধবেন্দ্রপুরীর সংস্পর্শেই তাঁর ধর্মপ্রতিভার প্রথম জাগরণ ঘটেছিল।

বাংলার আধ্যাত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে 'পুরী'দের যেন একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসদীক্ষা পেয়েছিলেন তোতাপুরীর কাছে।[৬]

বাংলা ভক্তির দেশ, ভক্তের দেশ। জগন্নাথ মন্দিরে চৈতন্য যে-পাথরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করতেন, সে পাথর, তাঁর প্রেমভক্তির অশ্রুধারায় ক্ষয়ে গিয়েছিল।

যখন তিনি সন্ন্যাস নিলেন, তখন গুরুর নিকট নিজের যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছিলেন নিজের জিহ্বায় চিনি রেখে, না গলিয়ে। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বৃন্দাবন উদ্ধার করলেন, ভক্তিমার্গেই এ ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন।[৭]

কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর তথাকথিত শিষ্যদের অধিকাংশই জানেন না, কিভাবে তাঁর শক্তি এখনও সারা ভারতে সক্রিয়। কি করেই বা জানবেন? এই শিষ্যরা হয়েছেন গদীয়ান (মঠের প্রধান), আর তিনি ঘুরেছিলেন খালিপায়ে, ভারতের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে, আচণ্ডালে মিনতি জানিয়েছেন ভগবানকে ভালবাসতে। ..[৮]

চৈতন্য ধর্ম আন্দোলনই আমাদের শেষ আন্দোলন; তোমাদের মনে থাকতে পারে, এ আন্দোলন ছিল জীবনমুখী। সেকালে জৈনধর্মের কথা ছিল ঠিক বিপরীত—আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দেহকে ধ্বংস করা।.. ভারতে প্রত্যেক যুগে এমন সব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় দেখা যায়, যাদের কোনটির মধ্যে থাকে চরম দৈহিক নিগ্রহ, কোনটিতে থাকে চরম ইন্দ্রিয়াসক্তি। ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য কেউ ইন্দ্রিয়গুলিকে করেছে উপায়, কেউ করতে চেয়েছে উৎপাটন। [৮]

বৈষ্ণবধর্ম বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে,—এই যে তোমার এত ভালবাসা তোমার বাবা-মা, ভাই স্বামী বা শিশুর জন্য, এ সবই ঠিক আছে; তোমায় কেবল ভাবতে হবে, কৃষ্ণ ওই শিশু, যখন তোমার শিশুকে খাওয়াচ্ছ, ভাববে কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছ!' এ কথাই বলেছিলেন চৈতন্য—'ঈশ্বরকে উপাসনা কর তোমার ইন্দ্রিয় দিয়ে।' বেদান্তের কথা ঠিক বিপরীত—'সংযত কর, দমন কর তোমার ইন্দ্রিয়।'[৯]

জীবন্মুক্ত হওয়া বরং সহজ, কিন্তু আচার্য হওয়া কঠিন। জীবন্মুক্ত জানেন সংসারটা স্বপ্ন এবং এ নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আচার্য সংসারকে স্বপ্ন বলে জেনেও তার মধ্যে থেকেই কাজ করেন। যে-কেউ আচার্য হতে পারেন না—দৈবী শক্তি যাঁর মধ্য দিয়ে কাজ করে তিনিই আচার্য। সাধারণ মানুষের শরীর থেকে আচার্যের শরীরটাও পৃথক। সেই শরীরের সম্পূর্ণ সাম্য অবস্থা বজায় রাখার একটা আলাদা বিজ্ঞানই আছে। তাঁর দেহের যন্ত্রপাতি অতিশয় সূক্ষ্ম, অত্যন্ত স্পর্শকাতর, পরম আনন্দ ও চরম দুঃখ—দুটোই গ্রহণ করতে পারে। তাঁকে বলা যায় ক্ষ্যাপাটে। .. নদীয়াবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যে এইরকম ভাবের যে দিব্যপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না... ।[১০]

কালক্রমে রূপ-সনাতন শ্রীজীবের মত বিরাট পুরুষদের পতাকাবহনের ভার এসে পড়ল বাবাজীদের কাঁধে; শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের ভরাস্রোত দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। অবশ্য সম্প্রতি আবার এক নতুন উদ্দীপনা ও অভ্যুত্থানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আশা করি হৃত গৌরব আবার ফিরে আসবে।[১১]

স্বামীজী—শ্রীচৈতন্যের ছিল প্রবল বৈরাগ্য—কামের কোন বালাই ছিল না তার মধ্যে। যে-প্রেমাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনে, তা ছিল আপনহারা এবং কামগন্ধ বর্জিত। সেই নিষ্কাম প্রেম সাধারণের জন্য নয়। কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা, মহাপ্রভুর জীবনে যে প্রবল বৈরাগ্য, তার উপর প্রথমে জোর না দিয়ে মহাপ্রভুর প্রেমাদর্শ প্রচারেই সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এর ফল হল এই, সাধারণ মানুষ সেই দিব্য প্রেমের উচ্চ আদর্শের মর্ম গ্রহণ করতে পারল না, নরনারীর ইতর কাম সম্বন্ধের সঙ্গে এই প্রেমের পার্থক্য তারা ধরতে পারল না।

প্রশ্ন—কিন্তু তিনি ত আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়েছিলেন; তাহ'লে এতে সাধারণের অধিকার থাকবে না কেন?

স্বামীজী—আমি তাঁর নাম প্রচারের কথা বলছি না, বলছি তাঁর রাধা-প্রেমের কথা—যে-রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তিনি দিবারাত্র নিজেকে ভুলে থাকতেন।

প্রশ্ন—সেই প্রেমে সকলের অধিকার থাকবে না কেন?

স্বামীজী—জাতটার দিকে তাকিয়ে দেখ না, এর ফলটা কি হয়েছে! চারশ বছর ধরে রাধাপ্রেমের পিছনে দৌড়ে বাঙালী তার সমস্ত পৌরুষ হারিয়েছে। লোকে পারে শুধু কাঁদতে, ওইটিই হয়েছে আমাদের জাতীয় চরিত্র। জাতির চিন্তাভাবনার পরিচয় যেখানে, সেই সাহিত্যে দেখ এই চারশ' বছর ধরে খালি বিলাপ আর কান্না। প্রকৃত বীররসের কাব্য কোথায়?

প্রশ্ন—তাহ'লে ওই প্রেমে প্রকৃত অধিকার কার?

স্বামীজী—মনে বিন্দুমাত্র কামভাব থাকা পর্যন্ত ওই প্রেম হতে পারে না। যার প্রবল বৈরাগ্য আছে, সেই পুরুষসিংহ ছাড়া ওই দিব্যপ্রেমে আর কারও অধিকার নেই। সাধারণ মানুষকে ওই উচ্চতম প্রেমভাবের পথে চলতে বললে, তা তার লৌকিক ভাব জাগিয়ে তুলবে—ঈশ্বরকে কান্ত-কান্তাভাবে ভাবতে গিয়ে সাধারণ মানুষ বসে ভাবতে থাকবে নিজের স্ত্রীর কথা—ফলটা ত বুঝতেই পারছ।

প্রশ্ন—নামকীর্তনে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। শাস্ত্রেও আছে, আর শ্রীচৈতন্যদেবও নাম প্রচার করেছিলেন। খোল বাজনা শুনলে বুকের ভিতরটা এমন লাফাতে থাকে যে মনে হয় নাচি।

স্বামীজী—সে ত ঠিকই। কিন্তু কীর্তন মানেই নর্তন নয়। কীর্তন মানে ঈশ্বরের গুণকীর্তন—তা যে ভাবেই তুমি করনা কেন। বৈষ্ণবদের ভাবাবেশ নৃত্য বেশ দোলা লাগায়। তবে এর একটা বিপদও আছে। সেটা বাঁচিয়ে চলতে হবে। বিপদ হল এর প্রতিক্রিয়ায়। একদিকে চড়া আবেগের চাপে চোখের জল বেরিয়ে আসা, নেশার ঘোর, মাথা ঘোরা; অপরদিকে সংকীর্তন থেমে গেলেই আবেগের চূড়া থেকে আকস্মিক পতন। সমুদ্রে ঢেউ যত জোরে উপরে ওঠে, তত জোরে নীচে এসে পড়ে। এই প্রতিক্রিয়ায়,

আঘাত সামলানোই কঠিন; মাত্রাবিচার না থাকলে মানুষ তখন ইতর কাম প্রবৃত্তির মোহে পড়ে।…

প্রশ্ন—আপনি বলুন, শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ভাবাদর্শের কোনগুলি আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি?

স্বামীজী—ঈশ্বরের আরাধনা—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পথে। ভক্তির সঙ্গে মাত্রাবিচারটুকু রেখে চলবে। এ ছাড়া, শ্রীচৈতন্যের থেকে নাও তাঁর হৃদয়—সর্বজীবে তাঁর দয়া ভালবাসা, ঈশ্বরের জন্য তাঁর অনন্ত আবেগ, তাঁর বৈরাগ্যকে করো তোমার জীবনের আদর্শ।[১২]

আকর গ্রন্থ:

১	Complete Work, of Swami Vivekananda—Centenery Volume	Volume VI, p. 320
২.	Do	Volume III, p 265-267
৩.	Do	Vol. III, p 324-325
৪.	Do	Vol. IV, p 337
৫.	Do	Vol. III, p 265-267
৬.	Do	Vol. IV, p 337
৭.	Do	Vol. VI, p 123
৮.	Do	Vol. IV, p 337
৯.	Do	Vol. VII, p 268
১০.	Do	Vol. V, p 269
১১.	Do	Vol. IV, p 337
১২.	Do	Vol. V, p 344-346

Personal Diary of Sri Surendra Nath Sen
24th January, 1898

ভক্তিযোগে শ্রীচৈতন্য

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)

নামকীর্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়। নামের মহিমা গৌরাঙ্গদেব যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কিনা, জানি না। তিনি বারংবার বলিয়াছেন 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'॥ (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥" পদ্যাবলী-২২ শ্লোক

"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়; যে বিষয়বাসনা মহাদাবাগ্নির ন্যায় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বিষয়বাসনা নির্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়; ব্রহ্মবিদ্যা অসূর্যম্পশ্যরূপা বধূর ন্যায়। বধূ যেমন অন্তঃপুরের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করেন, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, 'গুহ্যাতিগুহ্যম্'; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সেই ব্রহ্মবিদ্যার জীবনস্বরূপ; ইহা দ্বারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহার প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন; ইহাতেই মানুষ রসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায়"।·

কিরূপে নামকীর্তন করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে গৌরাঙ্গদেব তাঁহার ভক্তদিগকে উপদেশ দিয়াছেন 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"॥ "তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম কীর্তন করিবে।"

ভগবানের কোন্ নামে তাঁহার কী শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে, নামকীর্তনের সময় তাহার চিন্তা করা প্রয়োজন; তাহা না করিলে কীর্তনে লাভ কী? কেবল আমোদের জন্য কীর্তন হইলে সে কীর্তন ব্যর্থ। নামজপ করিতে হইলেও নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হইবে।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শত লক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি॥ মহানির্বাণতন্ত্র-৩।৩১

"যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিংবা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শতলক্ষবার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না।"···

"সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়।"·· শ্রীরূপগোস্বামী এই সাত্ত্বিক ভাবগুলি বিকাশের চারিটি স্তর দেখাইয়াছেন—

'ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্ত সংজ্ঞিতাঃ।
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্বিধাঃ'॥

"ইহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি-প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

জগন্নাথদেবের রথাগ্রে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন, তখনকার তাঁহার ভাব মনে করুন—

'উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার; অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল।
মাংস-ব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত; শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়; লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।
সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম; জজ, গগ, জজ, গগ গদ্গদ বচন।
জলযন্ত্রধারা যৈছে বহে অশ্রুজল, আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল।
দেহকান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ; গৌরকান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম।
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায়; শুষ্ক কাষ্ঠ সম পদ, হস্ত না চলয়।

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য-১৩

গৌরাঙ্গের শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইতেছে। যখন হৃদয় প্রেমে ডুবিয়া যায়, তখন এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়।... ভাব হইতেই প্রেমের উদয় হয়। ভাবের চালনা হইলে প্রেম উপস্থিত হয়।

'সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব-৪।১

"যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যগ্‌রূপে নির্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব, তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম কহিয়া থাকেন।"

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥ নারদপঞ্চরাত্র

"অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একমাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেমযুক্তা মমতা, তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন"।

নারদ ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'; শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'॥...ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য শাণ্ডিল্য কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ... ইত্যাদি।...

বিরহের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্য। তাঁহার বিরহ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিগণের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

বিরহের আরম্ভ— কাহে পুন গৌরকিশোর।

অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥

কনক-বরণ তনু ঝামর ভেল জনু,
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন,
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নরনারী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

বিরহের ভাব যখন গাঢ় হইল— সোনার গৌরচাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি, হা নাথ বলিয়া কাঁদে॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, থির নয়নে নেহারি॥
বিরহ অনলে, দহয়ে অন্তরে, ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করব, কোথা বা যাওব, কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পীরিতি, সতত সে রসে ভোরা॥

বিরহোন্মাদ— আরে মোর গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, মনের ভরমে পঁহু ভোর॥
খেনে উচ্চৈঃস্বরে গায়, কারে পঁহু কি সুধায়, কোথায় আমার প্রাণনাথ।
খেনে শীতে অঙ্গ কম্প, খেনে খেনে দেয় লম্ফ, কাঁহা পাও, যাঁও কার সাথ॥
খেনে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি, খেনে খেনে করয়ে প্রলাপ।
খেনে আঁখিযুগ মুছে হা নাথ বলিয়া কান্দে, খেনে খেনে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়ে চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে, বঞ্চিত হৈনু মুঞি কেন॥

বিরহের দশমী দশা

আজু মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধূলায় লোটায় কাঁচা সোনার কলেবর॥
মুরছি পড়য়ে দেহ, শ্বাস নাহি বয়।
চৌদিকে ভকতগণ হেরিয়া কাঁদয়॥
কি নারীপুরুষ সবে হেরি হেরি কাঁদে।
পশু-পাখী কাঁদে, তারা থির নাহি বাঁধে॥

ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ বলিতে গৌরাঙ্গ রূপগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—
ভক্তভেদে রতিভেদে পঞ্চ পরকার ; শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর।
বাৎসল্যরতি, মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ ; রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ।
চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য-১৯

ভক্তভেদে ভক্তিরস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ভক্তি আরম্ভ হয় না। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। শান্তিরসের দুইটি গুণ—ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংসার-বাসনা-ত্যাগ। এই দুইটি গুণে ভক্তির পত্তন। আকাশের শব্দগুলি যেমন সমস্ত পঞ্চভূতেই আছে, সেইরূপ শান্তরসের গুণদ্বয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে আছে। শান্তরসে ঈশ্বরে মমতা হয় না, কেবল তাঁহার স্বরূপজ্ঞান হয় মাত্র, তিনি যে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা—এই জ্ঞানটি হয়। দাস্যরতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়—ভগবান প্রভু, ভক্ত দাস। ভগবান্‌কে ভক্ত প্রচুর পরিমাণে সম্ভ্রম ও গৌরব দেখান। তাঁহার দাস বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দবোধ করেন; আদর্শ দাস যেমন প্রভুর সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তও তেমনি ভগবানের সেবা করিতে ব্যাকুল হন। সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার সহিত গলাগলি, কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, ক্রীড়া-কৌতুক। ভক্ত—

'কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রস; কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য-১৯

বাৎসল্যরসে ভগবান্ গোপাল। ভক্ত তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আদর করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন।···

মধুর রসের কথা আর কী বলিব? ··ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কিছু হইতে পারে না। এ অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান্—সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্য এইভাবে বিভোর ছিলেন।···

ভক্তের প্রাণ এই ভাবকুসুমের সৌরভে পরিপূর্ণ হইলে, ঊর্ধ্বে - অতি ঊর্ধ্বে, অত্যন্ত ঊর্ধ্বে—কামকুক্কুরের দৃষ্টির কোটিযোজন দূরে, যেখানে রজনী নাই, যেখানে পবিত্রতার বিমল বিভায় সমস্ত দিক আলোকিত, পাপপিশাচ যে স্থলের মোহিনী মাধুরী কল্পনাও করিতে পারেনা, দিব্যধামের সেই প্রমোদকুঞ্জে অতি নিভৃতে হৃদয়নাথ তাঁহার ভক্তকে—

"রাতিদিন চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে, ঘন ঘন মুখখানি সাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্তি নাহিক পায়, কত বা আরতি হিয়া মাঝে।" ··
—বলরাম দাস।

এ অবস্থায় ভক্ত ও ভক্তের প্রাণবল্লভ—

"দোঁহে কহে দুঁহু অনুরাগ। দুঁহু প্রেম দুঁহু হৃদে জাগ॥···
দুঁহু ভুজ পাশ করি, দুঁহু জন বন্ধন, অধর সুধা করু পান।"

এ আধ্যাত্মিক খেলা আমাদিগের বুঝিবার অধিকার কোথায়? এই মধুর রসে সাঁতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুকে দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

"সেই তো পরাণনাথ পাইনু, যার লাগি মদনদহনে ঝরি গেনু।" চৈতন্যচরিতামৃত ভগবান করুন, আমরা যেন সকলেই গৌরাঙ্গের এই মদনদহনে দগ্ধ হই। পৈশাচিক মদন যেন এই বসুন্ধরা হইতে চিরদিনের তরে নির্বাসিত হয়। কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমাগ্নি সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হউক।

আকর: 'ভক্তিযোগ'। ১৮৮৭ সালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩)

"শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার আর একটা উপাদান। রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আচার্য্য সম্প্রদায় যে নানাবিধ বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সে সকল অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিকীর্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি। এই সকল হিন্দুস্থানী ভজনে ও কীর্তনে শ্বপচাদি অস্পৃশ্য জাতিসকল গণ্ডীর বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় হরিসংকীর্তনে সে বাধা নাই, উচ্চনীচ সকল জাতি সমানভাবে কীর্তন আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীতনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙ্গালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকই নহে, এই কীর্তনক্ষেত্রে সকল জাতীয় কীর্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেই কীর্তন মণ্ডলীর উপরে হরির লুটের বাতাসা চড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এতটা বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ, কোন প্রদেশের বৈষ্ণব করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্তনে এমন ব্যাপার হইয়া থাকে।"[১]

"প্রথম ইসলামধর্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে একপক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হন। ভারতে ইসলাম ধর্মপ্রচারের ফলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। হিন্দুসমাজদেহে যাহারা চিরকাল নীচ ও অন্ত্যজ হইয়াছিল, ইসলামের কৃপায় তাহারা শ্রেষ্ঠের সমান হইয়া উঠিল। যে চণ্ডাল হিন্দু থাকিলে কখনই কোনও উচ্চ জাতির সহিত একাসনে বসিতে পাইত না, সে মুসলমান হইলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত একাসনে বসিতে পাইত। ফলে, হিন্দুসমাজের ভিত্তির স্বরূপ শিল্পকুশল শূদ্র জাতি সকল দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। সমাজে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্যদিকে সাদী, হাফেজ, ফর্দৌসী, ওমরখায়াম প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতনভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাববিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষীগণ ইসলাম-শক্তির সহিত একটা আপোষ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতিনির্বিশেষে শৈবধর্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। রামানন্দ বৈষ্ণবধর্মকে এই হিসাবে সর্বজাতির সেব্য করিতে চাহিলেন। গুরু নানক ব্যবহার ধর্ম বা morality কে ভক্তিতে ডুবাইয়া, সন্ন্যাসের সহিত মিশাইয়া, ইসলাম ও হিন্দুর আপোষে শিখধর্মের সৃষ্টি করিলেন। শেষ বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্মের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরপ্রেম ও মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইলেন।

এইভাবে ইসলামের সহিত হিন্দুদের কতকটা আপোষ হইল। হিন্দুসমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল।"[২]

"বাঙ্গালায় যখন প্রথম পাঠান অভিযান হয়, তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অতিমাত্রায় ছিল।··· বাঙ্গালায় পাঠানগণ আসিলে এবং পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ জয় করিয়া বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে খুব আদরের আসন দিয়াছিলেন। এই আদরের ফলে পূর্ববঙ্গের অর্দ্ধেকটা—সমাজের নিম্নতম স্তরটা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, পাঠানদিগের সহিত বৈবাহিক কুটুম্বিতা করে। মোগলমারীব তিনটা যুদ্ধে পাঠান অপেক্ষা বাঙ্গালার কৈবর্ত্ত, আগুরী, গোডো গোয়ালা প্রমুখ রণদুর্মদ জাতিসকল অধিকতব সংখ্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল। এই পাঠানের পতনকাল ও মোগলেব উদ্ভবকাল বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে একটা মহামুহূর্ত- সন্ধিক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সময়েই শ্রীচৈতন্যের উদ্ভব হয়, এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন অবতীর্ণ হন, এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন ঘটে, বাঙ্গালী সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা হয়। এই দেড়শত কি দুইশত বর্ষকাল বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির Angustan Per.od। একদিকে অরাজকত ও মাৎস্যন্যায়, অন্যদিকে নবদ্বীপে মনীষার প্রদীপ শতদ্যুতিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতাব বনিয়াদ গড়া হয়, Nauon bu.ld.ng বা জাতি সৃষ্টির কাজ আরব্ধ হয়। পাঠানের আগমনের তিনশত বর্ষকাল কত বিদেশী জাতি যে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করে, তাহার হিসাব করা এখন কঠিন। পাঠান সর্দারগণের অনেকেই বঙ্গ মহিলাদের পত্নীপদে বরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। সোনাবিবি ইহার একটা বড় দৃষ্টান্ত। আবিসিনিয়ার গোলাম হাবশী, জুজু, উজবেগ প্রভৃতি অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ বিদেশী মোসলেম বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করে, এবং বৌদ্ধ শৈথিল্যের কল্যাণে এক একটা সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়া রাখে। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনন্দন, দেবীবর প্রভৃতি মনীষীগণ বৌদ্ধ ও সহজ মতে শিথিলীকৃত বাঙ্গালী সমাজকে শ্রেণীবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিশিষ্টতা উপেত করিয়া দেন। তাঁহারাই বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের সৃষ্টিকর্তা এবং আদি দেবতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"[৩]

"শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় উৎকট সন্ন্যাসী বাঙ্গালায় বোধহয় তাহার পরে আর কেহ হয় নাই। কেবল তিনি সন্ন্যাসীই ছিলেন না, ভাবের সকল পর্যায়, ভক্তির সকল লক্ষণ তিনি নিজে স্বদেহে ফুটাইয়া, নিজে করিয়া-কর্মিয়া এক একটির উন্মেষক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তির সকল লক্ষণ তাঁহাতে প্রস্ফুটিত হইত বলিয়াই তাঁহাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই মনে করিত। ভক্তির এমন সজীব দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আর কেহ তেমন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ।··

কেশবচন্দ্রে বৈষ্ণবভাব ফুটিতে না ফুটিতে তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সে কাজটা ভগবান রামকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সে কার্য্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ফলে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম এখনও-

নূতনভাবে সঞ্জীবিত হয় নাই।... ভবিষ্যতে যদি করুণানিধান শ্রীভগবানের কৃপায় কোন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সংসারের সর্বস্ব বিসর্জন করিয়া এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিই আবার বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার করিতে পারেন।"[৪]

আকর : ১. 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা' : বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩২৯
২. 'নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান': সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৫
৩. 'বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়' : বঙ্গবাণী, কার্তিক, ১৩২৯
৪. '৺শিশিরকুমার ঘোষ' : প্রবাহিনী, ২০ পৌষ, ১৩২১

সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস

চৈতন্য চন্দ্রোদয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত, এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়-শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়েই স্মার্ততিলক রঘুনন্দন, এই সময়েই চৈতন্যদেব, এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগেব অপূর্ব গ্রন্থাবলী, চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূবে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।[১]

ইউরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউবোপ সভ্য হইযা গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউবোপ ফিরিয়া পাইল, ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূল পরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বল প্রাপ্ত হয়, ইউবোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন, ইউরোপেব এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল।

আমাদিগের একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্মতত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িনী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়, সে কোথা হইতে?

আমাদের এই Rena.s.ance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল, এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল?…সকল কথা; প্রমাণ কর।[২]

আকর: ১. 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্গদর্শন, ১২৮১ (১৮৭৪ খ্রীঃ)
২. 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ (১৮৮০ খ্রীঃ)

সমাজ সংস্কারক চৈতন্য

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)

আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, সম্ভবতঃ উপলব্ধিরও বাইরে, সমাজের বুকে বিরাট শক্তিগুলি নীরবে কাজ করে চলেছে। এদের বিধিনির্দিষ্ট ভূমিকা এরা যথাসময়েই পালন করবে। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বজ্রযোগিনীর পণ্ডিতেরা তাঁদের বোঝাই তূণ থেকে শাস্ত্রবচনের তীক্ষ্ণশর বা অভিশাপের বজ্র নিক্ষেপ করতে পারেন, তাতে কালের অগ্রগতিকে রোধ করা যাবে না, এবং এমন একদিন আসবে যখন আমাদের উত্তর-পুরুষেরা সম্ভবতঃ অবাক হয়ে ভাববে তাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষেরা নারীজাতির উপর এমন নিষ্ঠুর অন্যায় কিভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ আমরা জানি না, কিন্তু অতীত আমাদের কাছে একটা খোলা বইয়ের মত, এবং অতীত আমাদের বলছে. সনাতন ধর্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে রঘুনন্দন যখন হিন্দুআইন ও স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করছিলেন, তাঁর প্রায় সমকালেই, আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি মানুষে মানুষে, পুরুষে-নারীতে ভেদ তুলে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-মুসলমানকে দেখেছিলেন সমচক্ষে এবং নারীসমাজকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাধ্যতামূলক বৈধব্য থেকে। কে বলতে পারে, কালে হয়ত সংস্কৃত বিদ্যার এই প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলিতেই প্রজ্ঞার উদার আলোকে সুখী ভবিষ্যতের পথ দেখাতে, হিন্দু বিধবার পরিত্রাণে, আবার এক চৈতন্য আসবেন!

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের সামাজিক সমস্যাগুলি অত্যন্ত কঠিন এবং অস্বাভাবিক জটিলতায় ভারাক্রান্ত। হিন্দুদের এমন কোন সামাজিক প্রশ্ন নেই যা তাদের ধর্মের সঙ্গে জড়িত নয়। কোন সামাজিক প্রথাকে কোন-না কোন ভাবে ঈশ্বর-অভিপ্রেত বলে তুলে ধরতে পারলেই, লোকের মনে তা বদ্ধমূল হয়ে বসে যায়; যুক্তির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, আবেগের ভূমিতেই এই সব বিশ্বাস শিকড় ছড়ায়।

ভারতে সমাজসংস্কারককে এইভাবে যুদ্ধ করতে হয় এমন সব বিধিবিধানের বিরুদ্ধে যে-গুলোকে প্রায় ঐশ্বরিক বলে মনে করা হয়, সহজ বুদ্ধি দিয়ে বা জোর খাটিয়ে যেগুলোকে তেমন কাবু করা যায় না। পুরুষানুক্রমে মেনে আসার ফলে এগুলি শেষে দৃঢ়মূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সমাজসংস্কারককে যুদ্ধ করতে হয়েছে এই চিরাগত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস দিয়ে গড়া অচলায়তনের বিরুদ্ধে; এবং কখনো কখনো এতে যে তিনি যথেষ্টমাত্রায় সফলও হয়েছেন—যেমন হয়েছিলেন চৈতন্য—তাতে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বেরই নয়, ভারতের মানুষের মনোভঙ্গির বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের মানুষ চিরকাল প্রকৃত মহত্তের আহ্বানে, মহৎ প্রয়াসে সাড়া দিয়েছে; উদ্দেশ্য মহৎ হলে তথাকথিত পবিত্র অনুশাসন লঙ্ঘন করতেও তাদের বাঁধেনি। আক্রান্ত সামাজিক প্রথাগুলি দীর্ঘকাল যে দৈবীমহিমার আশ্রয় লাভ করে এসেছে, সে-মহিমাকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে অবতারকল্প মানুষের বাস্তব উপস্থিতির মহিমা।

তাঁর বাণীর মধ্যে তারা পেয়েছে স্বর্গীয় আলোর বন্যা—যাতে বিশ্বাসে নবউদ্যমে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, দিয়েছে অবাধ আনুগত্য। তারা অনুভব করেছে, অবতার এসেছেন পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে নতুনের বার্তা প্রচার করতে। কোন লোকাচারের বন্ধন নেই তাঁর, কোন নিয়মকানুনের বশ্যতা নেই তাঁর। তাঁর মধ্যে রয়েছে দিব্যসত্যের স্বতঃ উদ্ভাসের অনুপ্রেরণা, সেই সত্যকে তিনি এমনভাবে তুলে ধরেন যা মানুষের হৃদয়-স্পর্শ করে, মানুষের কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে।

এই রকম অবতার ছিলেন চৈতন্য—বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। বুদ্ধের মত তিনিও ছিলেন প্রচলিত লোকাচার বিরোধী। জাতিভেদ ও বৈধব্যবিষয়ক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

এইভাবেই ভগবদ্‌-নির্বাচিত পুরুষের মাধ্যমে, এক দৈববাণীর বিরুদ্ধে আরেক দিব্যবাণীর উদ্ভব হয়। পুরাতন অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না, নূতনে পুরাতনে সংঘাত চলতেই থাকে এবং মানবতার স্বপক্ষে যাঁরা, তাঁরা এই দ্বন্দ্বে প্রগতিমূলক শক্তিকেই বরণ ক'রে সেই শুভশক্তিকে জয়ী করতে চান। এইভাবে প্রগতির একটা স্তরে পৌছানো সম্ভব হয়। নতুন প্রেরণার ডানায় ভর ক'রে আমাদের ধ্যান-ধারণা এগিয়ে চলে। নতুন ভাবধারার মধ্যে থাকে অনুপম শক্তি যা ঝরণাধারার মত প্রথার পাহাড়ে-গা বেয়ে ঝরে পড়ে, কঠিন পাথরকেও ক্ষইয়ে দিয়ে নিজের ক্রমপ্রসরমান পথে এগিয়ে চলে।

আকর : A Nation in Making, p. 101, 141, 396

বাংলার বৈষ্ণবধর্মে সমাজসংস্কার ও গণআন্দোলন

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলন কেবল এক নতুন পারমার্থিক তত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্ব বা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গীতিকবিতাগুলিকে নবমাধুর্যই দান করেনি, এই আন্দোলন সমাজকে শুনিয়েছে এক নতুন বাণী—সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধনায় ব্রতী হয়েছে এই নববৈষ্ণব আন্দোলন।

॥ সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলন ॥

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাবে বাবা নানক, উত্তর ভারতে কবীর দাদূ ও রামানন্দ, দক্ষিণে তুকারাম এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্য যে আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তা একদিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু ধ্যান ধারণা এবং অপরদিকে ইসলামের মনোজয়ী মানবিকতা বিশেষতঃ পারসীক সংস্কৃতি প্রভাবিত সমৃদ্ধ কাব্যদর্শনের সংস্পর্শের ফল।

পারস্যের আর্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে ইসলামের চিন্তাধারায় যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর এসেছিল, তার সঙ্গে কিছুটা তুলনা চলে খ্রীষ্টধর্মের উপর গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবের। ইসলাম আরবদেশ থেকে সরাসরি ভারতে এলে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে তার কোন মিল পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ, অথচ এই মিলের উপরই নির্ভর করছিল ভারতে ইসলামের প্রচার সাফল্য।

পারসী-পরিস্রুত ইসলামীয় ধর্মপ্রাণতা ও কাব্য সম্পদের প্রভাব এসে পড়ল মধ্যযুগের হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনা ও ধ্যান ধারণার উপর। এর ফলে হিন্দুর জীবনধারা ও চিন্তন মননের ক্ষেত্রে এক নতুন সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। দেশব্যাপী বৈষ্ণব অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সেই সমন্বয় দেখা দিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যের ধারাপথে এই বৈষ্ণব আন্দোলন ছিল মূলতঃ প্রতিবাদী চরিত্রের—প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম এবং তার সামাজিক-আর্থনীতিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে ছিল এর প্রতিবাদ।

পাঞ্জাবে এই আন্দোলন থেকে জন্ম নিল নতুন এক ধর্ম—শিখধর্ম। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের এই ভক্তি আন্দোলনের ফলে একটা ভাঙা-গড়ার পালা শুরু হল—এর মধ্য দিয়ে এল এক নবজাগরণ। এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ফল বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের বিকাশের মধ্যে। উত্তর ভারতে হিন্দি, দক্ষিণে মারাঠি, আমাদের নিজেদের প্রদেশে বাংলা সাহিত্য এক নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হল,—মানুষের নতুন ভাবনা ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটল সাহিত্যে। এর ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় গড়ে উঠল এক নতুন ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম সাহিত্য যা এতকাল আবদ্ধ ছিল সংস্কৃত ভাষার নিগড়ে। এইসব

নবসৃষ্ট মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে এল প্রতিভাধর মানুষদের কাছে। এইভাবে বৈষ্ণব অভ্যুত্থান সমগ্রদেশে গণ আন্দোলনের পথ খুলে দিল।

॥ বৈষ্ণব সমাজে শিক্ষা বিকাশ ॥

বাংলায় এই গণ আন্দোলন সুতীব্র হওয়ার কারণ বাঙালী এর আগেই বৌদ্ধ-উত্তরাধিকার-জাত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে এসেছিল। পাঞ্জাবে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের স্থানে এল বাবা নানকের স্বতন্ত্র ধর্মশাস্ত্র। স্মরণাতীতকাল থেকে হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি-সমাজে বেদের যে স্থান, নানকের অনুগামীদের কাছে সেই স্থান নিল 'গ্রন্থ সাহেব'। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে না পারলেও বাংলার বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনবেদ 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'কে গ্রহণ করল নিজেদের শাস্ত্ররূপে। বাংলা ভাষায় রচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যে ভাগবত, ভগবদ্গীতা, এবং উপনিষদ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে চৈতন্য প্রচারিত নতুন তত্ত্বের প্রাচীন শাস্ত্রানুসারিতা দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া বাংলায় আরো অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হল—যেমন 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যভাগবত' ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই তিনখানি গ্রন্থ মিলেই বাংলার বৈষ্ণব শাস্ত্র গড়ে উঠেছে।

ফলতঃ বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে এল এক বিরাট ও ব্যাপক উন্মাদনা ও উদ্দীপনা। দৈনন্দিন পূজার্চনার অঙ্গ হল বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠ। মাতৃভাষায় ধর্মশাস্ত্রপাঠের উৎসাহ এদেশে জনশিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত সহায়ক হল।

বর্তমান শতকের প্রথমেও হিন্দুদের মধ্যে সাক্ষরতার দিক থেকে অগ্রণী ছিলেন বৈষ্ণব সমাজ। এই সমাজের পুরুষেরাই নন, স্ত্রীলোকেরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় অল্প বিস্তর শিক্ষালাভ করেছিলেন। উচ্চতম বর্ণ ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর বর্ণের অব্রাহ্মণদের মধ্যে এযাবৎ লেখাপড়ার যে-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল, এবার তা বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

॥ ব্রাত্যজনের মুক্তি ॥

শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে নানা অনুশাসনে খর্ব হয়েছিল তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা—সেই অনুশাসনের বেড়াজাল এবার খসে পড়ল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দু ব্রাহ্মণ আরোপিত জাতবিচারের ছুৎমার্গ দূর করতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে যারা 'অচ্ছুৎ' এবং 'জল-অচল', যাদের রান্না খেলে জাত যায়, সেইসব অব্রাহ্মণ, এমনকি 'অচ্ছুৎ'দের মধ্য থেকেও বড় জ্ঞানী গুণীকে তিনি এই নব বৈষ্ণব সমাজে এনে উঁচু আসন দিতে লাগলেন। এই নতুন ধর্ম-আন্দোলনে যে-সব ব্রাহ্মণ সন্তান যোগ দিলেন, তাঁদের পাশাপাশি এঁরাও সমমর্যাদায় গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁদের সকলকেই বলা হত 'গোস্বামী'। এযাবৎ ব্রাহ্মণ গুরু যে সামাজিক মর্যাদা পেতেন, এখন অব্রাহ্মণ গুরুরাও শিষ্যদের থেকে সেই মান

মর্যাদা লাভ করলেন। উপরন্তু হরিদাসের মত মুসলমান সন্তরাও ব্রাহ্মণের সমান মান্য হলেন। আবার যেসব হিন্দু-মুসলমান-রাজদরবারের সংস্পর্শে 'পতিত' হয়েছিলেন, তাঁরা বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করে সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেলেন এবং বৈষ্ণব সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্ব স্বীকৃত হল। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য সম্প্রদায়ে কেউ কেউ — যেমন রূপ সনাতন এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব—চিন্তাগুরু ও আচার্যের আসনলাভ করেছেন। তাঁরা গড়ে তুললেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন ও রসশাস্ত্র। এ সবের গভীর প্রভাব পড়ল বাঙালী জনগণের মানসিক উন্নয়নে—গোঁড়া হিন্দুয়ানি, তার জাতবিচার, তার চিরাগত সামাজিক প্রতিষ্ঠা কোথায় ভেসে গেল।

এই নববৈষ্ণব আন্দোলন বাংলাদেশে বস্তুত এক নতুন সমাজ গড়ে তুলল যে-সমাজে পুরানো স্মৃতিশাসনের পরিবর্তে গড়ে উঠল স্বতন্ত্র বিধিবিধান। এইসব বিধান যে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছিল, তা অবশ্য নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বেড়া ভেঙে জন্ম নেবে এক নতুন কৃষ্টিবান সমাজ। তিনি চেয়েছিলেন জাতিভেদ অনুসারী ব্রাহ্মণ্য বিধির আমূল পরিবর্তন। নববৈষ্ণব বিধানে জাতবিচারের বালাই না রেখে, হিন্দুসামাজিক আইনের আওতার বাইরে, বিয়ে করার স্বাধীনতা দেওয়া হল। অব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রী স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করতে পারত। এছাড়া মধ্যযুগীয় বাল্য বিবাহ প্রথার অবসান ঘটান হল এবং বিধবা বিবাহ চালু করা হল।

বিয়ের অনুষ্ঠানও অনেক সহজ হল। সেকালের গান্ধর্ব বিবাহের মত, বিয়ের ভিত্তি হল পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক নির্বাচন, কোন বর্ণগোত্রের বিচার নয়। ফুলের মালা বা কণ্ঠি (তুলসী মালা) বদল করলেই বিয়ে সিদ্ধ হল। শ্রাদ্ধ বা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াতেও বৈষ্ণবেরা সনাতন বৈদিক পদ্ধতি মানলেন না। পুরানো আচার অনুষ্ঠানের বদলে এল নামকীর্তন আর বৈষ্ণব ভাই বেরাদরদের নিয়ে ভোজ বা 'মহোৎসব'। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পূজার্চনার বৈদিক প্রথা এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অসপত্ন অধিকার—এ সবের বালাই ঘুচিয়ে দিয়ে বৈষ্ণবেরা যে-কোন উৎসবেই করতে লাগলেন নামকীর্তন আর মহোৎসব। এই কারণেই বলা হয়েছে—

> 'না করিবে অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।
> না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। অন্যদেবতার নিন্দা বন্দনা প্রসাদ গ্রহণ—কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।

॥ প্রতিক্রিয়া ও ফলশ্রুতি ॥

কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ—যাঁরা চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত হলেন, তাঁরা অনেকে নববিধানের দাবী মেটাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিসর্জন দিতে রাজী হলেন না। তাঁরা কেবল বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষাই নিলেন; ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নব সংস্কৃতিকে মেনে

নিলেও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের পুরনো বিধানই মেনে চলতে লাগলেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজ এইভাবে, বলতে গেলে প্রথম থেকেই, দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ল—একটি ধারা নববিধানের অনুগত, অপরটি শ্রীকৃষ্ণেব উপাসনা গ্রহণ করলেও পুরানো ব্রাহ্মণ্য বিধানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখল।

শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার সঙ্গে নারায়ণের প্রতীক শালগ্রাম পূজার একটা যোগ ছিল। এখন, নববৈষ্ণব ও গোঁড়া হিন্দু উভয়েরই শালগ্রাম উপাস্য হওয়ায়, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও নববৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে একটা সংযোগসেতু সহজেই গড়ে উঠল। এই সেতুপথে ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে লাগলেন, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্ধ আচার সর্বস্বতা ও অলৌকিকতার হাত থেকে সমাজ ও সংস্কৃতির মুক্তি। এই ব্রাহ্মণদেব আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীচৈতন্যের বিধানকে শাস্ত্র বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করা, চৈতন্যপন্থীদেব হিন্দু-সমাজ থেকে বহিষ্কৃতের পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া এবং নববৈষ্ণব সমাজেব হিন্দুদেব দিয়ে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি শাস্ত্রের কর্তৃত্ব আবার স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এব ফলে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের ঘর থেকে যাঁরা এসে বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তাঁরা হিন্দু গোঁড়ামির সঙ্গে আপোষ করে নিজেদের মানমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখলেন, আর বৈষ্ণবদের অধিকাংশ যাঁরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী থেকে এসেছিলেন, তাঁরাই এই বিষম পরিস্থিতিতে নববৈষ্ণব আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে, এই নতুন কৃষ্টিবান সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে নব্যবঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক বাণীর তাৎপর্য বস্তুতঃ নষ্ট হয়ে গেল। বৈষ্ণবেরাও আবার জাতবিচার মেনে চলতে লাগলেন এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় উৎসব ছাড়া, সকলকে সমান চোখে দেখার আদর্শও আর মানা হল না।

॥ অতিলৌকিক প্রতীকবাদে আচ্ছন্ন মানবিকতা ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের মধ্যে এইসব নানা স্তরের পরিবর্তনের ফলে চৈতন্যবাণীর মূল মানবিক প্রেরণাই যেন নষ্ট হতে বসল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অলৌকিকে বিশ্বাস, প্রতীকবাদ ও জাতবিচারের পুনরাবির্ভাবের ফলে, মানবপ্রেম ও মানবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরপ্রেমের অনুশীলন এবং নরের মধ্যে নারায়ণের উপলব্ধি—এককথায় বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ বস্তুতেই, বিকার দেখা দিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যযুগীয় মনোভাবে চাপা পড়ে গেল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব মানবিকতায় সমৃদ্ধ বাণী—মানুষে মানুষে অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও সাম্যের বাণী। আবার বৈষ্ণবদের মধ্যে এক ধরনের অবাস্তব ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাববিহ্বলতা দেখা দিল। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য—এই রসগুলির স্বাভাবিক আধার ছিল পরিবার ও সমাজ। কিন্তু এখন বৈষ্ণবেরা এইসব ভাবরসের উপলব্ধিতে তাঁদের বাস্তব পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করে অতীতের পৌরাণিক কৃষ্ণকথার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন; শ্রেষ্ঠরস 'মাধুর্যে'র স্বাভাবিক উৎস নরনারীর সহজ সম্পর্ককে তুচ্ছ করে

তাঁরা শ্রীরাধার সখী বলে নিজেদের কল্পনা করতে লাগলেন। এইভাবে, একান্ত -ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবুকতা ও কাল্পনিকতার স্রোতোবেগে বাংলার ভক্তিবাদের বাস্তব তাৎপর্য হারিয়ে গেল।

সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ করলেন শ্রীচৈতন্য। মায়াবাদের প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এখন আবার বৈষ্ণবদের মধ্যেও মায়াবাদের প্রাদুর্ভাব হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরাও এবার জগৎকে দেখতে লাগলেন মিথ্যা মায়ারূপে। ফলতঃ মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে এই নববৈষ্ণবধর্মের শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রভেদ রইল না।

তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের বড কথা হল এর সার্বজনীন আবেদন। হিন্দুধর্মের জাতিনির্ভর অধিকারীভেদের ব্যাপারটি শ্রীচৈতন্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ভগবানের নাম কীতনই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ পূজা ,--কোন নৈবেদ্য উপচার, আচার অনুষ্ঠান নয়, কোন পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, পূজার্চনা ভক্ত নিজেই করবেন, একবার ঈশ্বরের নাম নিলেই মানুষ দেহমনে পবিত্র হবে এবং ভগবানের পূজার অধিকারী হবে। এইভাবে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম জাতিকৌলীন্য-সামাজিক প্রতিষ্ঠার তোয়াক্কা না রেখে নরনারী মাত্রকেই ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অধিকার দান করল। এই সার্বজনীন পূজার মন্ত্র হল একটিই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এর সঙ্গে মহাপ্রভু আরেকটু যোগ করলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

নাম কীর্তন যেন যন্ত্রবৎ উচ্চারণ না হয়। নাম উচ্চারণে থাকবে বিনম্রতা—প্রকৃত বৈষ্ণব আরাধনার এইটি প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবকে হতে হবে সর্বংসহা—এমন কি যে শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর, তার প্রতিও অ-দ্বেষ ও সহিষ্ণুতা। তৃতীয়তঃ নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিতে হবে। এইভাবে, তৃণের মত দীন হয়ে (তৃণ সর্বদাই পদদলিত হয়), তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে, (গাছ কাটতে যায় যে, গাছ তাকেও ছায়া দিতে কার্পণ্য করে না), নিজের জন্য সম্মান কামনা না করে, অপরকে সম্মান দিয়ে, বিনম্রভাবে ভগবানের নাম করতে হবে।

॥ দিশারী পরম চেতনা ॥

এই একটি শ্লোকেই বস্তুতঃ বিধৃত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সমগ্র দর্শন ও আচরণীয় বিধি। প্রত্যেক মানুষে ঈশ্বর উপলব্ধির প্রয়াস রয়েছে এর মূলে। এখানে 'তৃণাদপি সুনীচ' যে নম্রতা তা নিছক আত্মদৈন্য নয়, তা আত্মবিস্মরণ। এই আত্ম-বিস্মরণই হল আত্মচৈতন্য থেকে বিশ্বচৈতন্যে উত্তরণের সোপান। সহিষ্ণুতা আসে ওই

বিশ্বব্যাপ্ত পরমচৈতন্যের অনুভবে। নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সেই পরমচৈতন্যের আরাধনা করে। বৈষ্ণব আরাধনায় নামই তার চলার পথ, নামই তার গন্তব্য ও ইষ্ট।

এই বৈষ্ণবাচার—একে যদি আদৌ কোন ধর্মাচার বলা যায়—শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনকে একটা বড রকমের হিতবাদী আন্দোলনে পরিণত করল। আগেও অহিন্দুরা হিন্দু হয়েছে—কিন্তু তা হয়েছে অহিন্দুর উপর হিন্দুর সামাজিক কাঠামো, বর্ণভেদ ইত্যাদি আরোপ করে। এই পথেই ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে শকহূণ প্রভৃতি যারা প্রবেশ করেছিল, তারা এদেশের হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্মকে বর্জন করেছিলেন। তাই তিনি ধর্মান্তরীকরণের এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল নাম নিতে বললেন, অন্যদেবের নিন্দন বন্দন ত্যাগ ক'রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ঐকান্তিক হতে বললেন। ফলতঃ মহাপ্রভুর প্রচার কখনই আগ্রাসী হয়ে ওঠে নি। খ্রীষ্টান সাহিত্যে যাকে বলা হয়েছে 'the Church Militant' বা ইসলামিক প্রচারে যে ধর্মীয় রেষারেষি বা পরধর্মে অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়, তার কোন ঠাঁই ছিল না মহাপ্রভুর এই প্রচারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দুসমাজের তথাকথিত নীচু জাতের মানুষদের মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। তাঁব আদর্শ ছিল—'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ।' হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণের চেয়ে বড। যে ব্রাহ্মণ হরিভক্তিপরায়ণ নয়, সে চণ্ডালের চেয়ে ছোট। এই বৈষ্ণবীয় আদর্শ জাতিভেদ-অধ্যুষিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে এক নীরব বিপ্লব এনে দিল। হিন্দুসমাজের বাইরে, মহাপ্রভুব শিক্ষায় সমগ্র অহিন্দু গোষ্ঠী বা উপজাতিগুলি নামধর্ম গ্রহণ করল এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মহাপ্রভুর সরল বিধানগুলি মেনে চলল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উত্তর পূর্ব ভারতে মণিপুরী গোষ্ঠীর সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন।

আকর: Bengal Vaishnavism, chapter v. (1933)

মায়ের দাবী ও চৈতন্যকথা

অরবিন্দ ঘোষ

"বাংলাদেশে আমরা ধর্মীয় উদ্দীপনা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি, দেশাত্মবোধে নিজেদের উৎসর্গ করিয়া, দেশবাসীর কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া, দেশবোধে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়া আমরা ওই হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।··

বাংলার প্রাণধর্মের প্রকাশ সর্বদা আবেগের মধ্য দিয়া হইয়াছে; বলা হয় বাংলা ভারতের মস্তিষ্ক হৃদয়—দুই-ই।·· এদেশ ন্যায় চর্চার কেন্দ্রভূমি, আবার চৈতন্যের জন্মভূমি। বাংলার বৌদ্ধিক বিকাশের উত্তুঙ্গ চূড়ায় চৈতন্য এক নিটোল সুন্দর বিকচ কুসুম।

·· বাংলার এই আত্মস্বরূপের নবজাগরণকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে প্রথমেই যাহা প্রয়োজন, তাহা হইল এই নব আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও উদ্দীপনাকে ধরিয়া রাখা! সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব—চৈতন্যের যেরূপ ছিল হরির প্রতি—দেশমাতার জন্য উহাই আজ বাঙালীর একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই বাংলা আবার বাংলা হইবে এবং বহু শতাব্দীর প্রস্তুতির পর যে বিধিনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে তাহার ডাক পড়িয়াছে, বাংলা তাহা পালন করিতে সক্ষম হইবে।·· 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' করিলেই স্বরাজ আসিবে না; আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনযাত্রায় স্বরাজকে প্রতিফলিত করিলে তবেই স্বরাজ আসিবে।···

কিন্তু কেমন করিয়া স্বরাজের আদর্শে জীবন যাপন করা যায়? স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া, উহার স্থলে জাতীয় চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়া। যেমন, চৈতন্য নিমাই পণ্ডিত হইয়া না থাকিয়া হইলেন কৃষ্ণরাধা বলরাম, সেইরূপ আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বিচ্ছিন্নতা পরিহার করিয়া জাতির মধ্যে বাঁচিতে হইবে।· শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি দেখিবার জন্য চৈতন্যের প্রেমাবেগের যে সর্বগ্রাসী উন্মাদনা, দেশমাতার স্বাধীন ও গৌরবদীপ্ত মুখখানি দেখিবার জন্য আমাদেরও ঠিক সেইরূপ আবেগ উন্মাদনা চাই। জগাই-মাধাই যেরূপ পরিপূর্ণ উৎসাহে রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গের সংকীর্তনে যোগ দিয়াছিল, দেশের জন্য আত্মনিবেদনে আমাদের ঠিক সেইরূপ উৎসাহ প্রয়োজন।"[১]

"চৈতন্যের 'প্রেম' প্রাণধর্মের মহিমান্বিত বিকাশের ধারাপথে আবির্ভূত এক স্বর্গীয় অধ্যাত্ম অনুভূতি। চৈতন্যের পূর্বে ও পরে যখনই বৈষ্ণবধর্ম বহির্মুখী প্রসারে সচেষ্ট হইয়াছে, তখনই, আমরা জানি, প্রাণধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে ব্যাপক দুর্নীতি ও অধঃপতন।···

অতিমানসের ভিত্তিমূলে আছে পরিপূর্ণ প্রশান্তি; দিব্যপ্রেম যতই তীব্র হউক না কেন, উহাতে ওই প্রশান্তি বিঘ্নিত হয় না, বরং আরো গভীর হয়। চৈতন্যের অভিজ্ঞতা অতিমানসের অভিজ্ঞতা নয়; প্রাণময় স্তরে ঊর্ধ্ব হইতে বহমান প্রেম-আনন্দের ধারা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। প্রাণের সাড়ায়, ঈশ্বরমুখী প্রেমানন্দের সুতীব্র

আবেগ ও ভাবোল্লাসের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার এইসব (অষ্ট সাত্ত্বিক) বিকারে। চৈতন্য রাধাভাবকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন কারণ অধ্যাত্ম-মনোভাবনায় আনন্দের অধিষ্ঠান উচ্চতর ভূমিতে; উপনিষদ সমূহের মতেও আনন্দই অনুভূতির চরম।"[২]

"চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার ও দিব্যপ্রেমের অবতার ছিলেন কিনা—এ সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁহার সম্পর্কে বিবিধ বর্ণনা হইতে সেই চরিত্রের বিকাশ স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাঁহার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, চৈতন্যাবতারে দিব্য স্বরূপের সেই ঐশ্বরিক প্রকাশ খুবই উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণে বিকাশের বহুমুখিতা ছিল কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় ভাবোন্মোদনার অতটা তীব্রতা ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের যোগ্য লেখনীতে তাঁহার দৈনন্দিন কথাবার্তা ও কার্যকলাপের নিঃসন্দিগ্ধ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

এই দুই মহান্ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনরূপ তুলনায় আমি আগ্রহী নই। উভয়ের প্রভাব ছিল অসাধারণ এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই"।[৩]

আকর : ১. 'The Demand of the Mother'—Bande Mataram, April 11, 1908.

২. 'Integral Yoga and Other Paths' p. 85, Centenary Vol. 22.

৩. 'The Purpose of Avatarhood. p. 418 Centenary Vol. 22.

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের লেখকের পরিচয়

ড. বিমানবিহারী মজুমদার

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও আদরণীয় গ্রন্থ আর নাই। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' পণ্ডিতের গ্রন্থ—আপামর জনসাধারণের নহে। শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সহজ ও সবল ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রগাঢ় প্রেমভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেইজন্যই হৃদয়গ্রাহী। 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র যত অধিক সংখ্যক হাতে লেখা পুঁথি পাওয়া যায়, এত আর অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের পাওয়া যায় না।

এরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থের গ্রন্থকার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক লেখক গ্রন্থমধ্যে নিজের বংশপরিচয় ও বাসস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারদের মধ্যে কবিকর্ণপূর, জয়ানন্দ, লোচন প্রভৃতি নিজের নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ছিলেন গৃহী। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, গোপালভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেদের কোন পরিচয় দেন নাই। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-বিবরণ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা গুরুর গৌরব বৃদ্ধির জন্য, নিজের মহিমা ঘোষণার জন্য নহে। বৃন্দাবন দাস যে নিজের কোন লৌকিক পরিচয় দেন নাই, বৈরাগ্য অবলম্বন তাহার কারণ হইতে পারে।

তিনি বহু স্থলে নারায়ণীর কথা লিখিয়াছেন; যথা ১।১।১১, ২।১০।১৪০, ৩।৭।৪৭৫ (প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পরের পৃষ্ঠাঙ্কগুলিও ঐ সংস্করণ হইতে দেওয়া হইবে)। কিন্তু একবার মাত্র বলিয়াছেন যে

সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত ॥—৩।৬।৪৭৫

শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্রী নারায়ণীর পুত্র বলিয়া নিজেকে পরিচিত করা, আর লৌকিক জীবনের পরিচয় প্রদান করা এক কথা নহে। কবির মনে নিজের লৌকিক পরিচয় দিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকিলে অন্ততঃ তিনি নিজের মাতামহের নাম করিতেন। তিনি শুধু নারায়ণীকে শ্রীরামের ভ্রাতৃসুতা বলিয়াছেন (২।২০।১৭০); কিন্তু কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা লেখেন নাই। কবিকর্ণপূর বলেন যে শ্রীবাসের চার ভাই এবং চারজনকেই মহাপ্রভু কৃপা করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, ৫।৯৩)। বৃন্দাবন দাস শুধু শ্রীবাস ও শ্রীরামের কথা লিখিয়াছেন—কবিকর্ণপূর শ্রীপতি নামে আর এক ভাইয়ের বিবরণ দিয়াছেন (ঐ ৫।২৯)।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেন যে, শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীরামের কন্যা নারায়ণী (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন, ১৩৪১, পৃঃ ৩২৬)। এই উক্তির পোষক কোন প্রমাণ নাই; বরং সুকুমার বাবু যে প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসের মত এই উক্তির অব্যবহিত

পূর্বে মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে নলিন পণ্ডিত নাম আছে। নারায়ণী শ্রীবাসের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা (প্রেমবিলাস, পৃ-২২১-২, যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণ)। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তি রত্নাকর ও নরোত্তম বিলাসের মত গ্রহণ করিয়া বলেন যে শ্রীবাসের আর তিনজন ভাইয়ের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। শ্রীনিধি নাম হইতে বুঝা যায় যে গোস্বামী মহাশয় প্রেমবিলাসের বিবরণ বিশ্বাস করেন নাই। বস্তুতঃ নারায়ণী শ্রীবাসেব কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীবাসের সকল ভ্রাতাই যখন মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন, তখন বৃন্দাবন দাস মাতামহের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন?

বৃন্দাবন দাস যে বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্বন্ধু ভদ্র (গৌরপদতরঙ্গিনী, প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা, পৃঃ ১২৮), অম্বিকাচবণ ব্রহ্মচাবী (বঙ্গরত্ন, দ্বিতীয় ভাগ) ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ পৃঃ ৩১২) স্বীকাব করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রেম বিলাসের' ত্রয়োবিংশ বিলাসের মতে—বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলিলেন স্বর্গে॥ পৃঃ ২২২ 'প্রেম বিলাসের' এই অংশ প্রক্ষিপ্ত— আধুনিকী সংযোজনা মাত্র। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রেমবিলাসে প্রদত্ত বৃন্দাবন দাসের কাহিনী বিশ্বাস না করিলেও উদ্ধৃত মত স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে "নারায়ণী গর্ভবতী হইলে তিনি বিধবা হন" (চৈতন্য ভাগবত, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৪)। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের এই মত মানিয়া লইয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিনী, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২১৬)। শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্রী নারায়ণী দেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, একথা মানিয়া লইতে বৈষ্ণব লেখকগণের মনে কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে বৃন্দাবন দাস বৈধ বিবাহেব ফলে জাত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"যদি ঐ সকল বৈষ্ণব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত কোন সময়ে কোন দুষ্ট মতাবলম্বী ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মের অমঙ্গলের চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং তৎপরে অতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরস্পর কর্ণাকর্ণী হইয়া আসিতেছে"। কিন্তু প্রাচীন মহাজনের গ্রন্থে যে নারায়ণীর বালবৈধব্যের কথা নাই, তাহা নহে। কবি কর্ণপূর ও বৃন্দাবন দাসের মতে বিশ্বম্ভর মিশ্র গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বৎসর সংসারাশ্রমে ছিলেন। বিশ্বম্ভরের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে শ্রীবাস গৃহে নাবায়ণী বিশ্বম্ভরের প্রসাদ খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস বলেন, ঐ সময় নারায়ণীর বয়স চার বৎসর—

> চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত।
> 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত॥ ২।২।১৭০

এই ঘটনা-প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

> শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্তৃকা মধুর দ্যুতিঃ।
> প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥ ২।৭।২৬

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই শ্লোক উদ্ধার করিবার সময়ে পাঠ লিখিয়াছেন—

শ্রীবাস ভ্রাতৃতনয়াঽ ভ্রাতৃকা মধুর দ্যুতিঃ।
হরেঃ প্রাপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥ চৈ. ভা., পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৩

কোন মেয়ের পরিচয় দিতে হইলে তাহার স্বামী আছে কি না বলা, ভাই আছে কিনা বলা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। সেইজন্য মনে হয় অমৃতবাজার কার্য্যালয়ের ছাপা বইয়ের "অভর্তৃকা" পাঠই ঠিক। প্রাচীন পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

প্রভুর চর্বিত পান স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে।
শৈশবে বিধবা ধনী সাধ্বীসতী শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্বিতে॥

আমার মনে হয়, নারায়ণী শিশুকালে অর্থাৎ চার বৎসর বয়সের পূর্বে বিধবা হইয়াছিলেন এবং যৌবন প্রাপ্তির পর তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। প্রভুর প্রসাদ খাইয়া কাঁদিবার সময়ে নারায়ণীর বয়স যে মাত্র চার বৎসর ছিল, বৃন্দাবন দাস তাহা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রভৃতি লেখকগণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া ১৪২৭ শকে নারায়ণীর বয়স নয় দশ বৎসর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিনী, প্রথম সং, পৃ. ১২৮)।

নারায়ণীর কত বৎসর বয়সে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে বৃন্দাবন দাসের কয়েকটি ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। ১৪৩০ শকে যদি নারায়ণীর বয়স চার বৎসর হয়, তাহা হইলে ১৩।১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইতে পারে না: অর্থাৎ ১৪৪০ শক বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় নাই। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন যে

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥—১।৮।৯২

কবি এই উক্তি বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক-জীবনের সমাপ্তিকাল-বর্ণনা-উপলক্ষেও করিয়াছেন (২।১।১৫৫)। বৃন্দাবন দাস ও কবিকর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে ১৪৩১ শকের গ্রীষ্মকালে যখন শ্রীচৈতন্য অধ্যাপনা বন্ধ করেন, তখন বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় নাই।

১৪৪০ শকে বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর হয়। ঐ বয়সের বালকের পক্ষে পুরীতে যাইয়া শ্রীচৈতন্য দর্শন সম্ভব নহে। বৃন্দাবন দাসও কোথাও এমন আভাস দেন নাই-যে তিনি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছেন। ১৪৪০

শকের পূর্বে যেমন বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইতে পারেনা, তেমনি ঐ সময়ের বেশী পরেও তাঁহার জন্মগ্রহণ সম্ভব নহে, কেন-না তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গ পাইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর দীর্ঘকাল ধরাধামে ছিলেন না।

'শ্রীচৈতন্য ভাগবতের' আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচারপূর্বক আমি বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল ১৪৪০ শকের বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি স্থির করিতে চাহি। বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সাধারণতঃ কোন শোনা কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈববাণী শুনিয়া সন ও তারিখ লিখিয়াছেন। কি প্রমাণ বলে ঐরূপ সন ও তারিখ তাঁহারা নির্ণয় করিলেন সে বিষয়ে পাঠকদিগকে কিছু বলেন নাই।

বৃন্দাবন দাসের জন্ম সময় সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করিতেছি।—

লেখক	গ্রন্থ	বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল
১। জগদ্বন্ধু ভদ্র	গৌরপদ তরঙ্গিনী, ১ম সং উপক্রমণিকা, পৃ. ১২৮	১৪২৯ শক, বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী
অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	বঙ্গরত্ন, ২য় ভাগ, পৃ. ৯	ঐ
অচ্যুতচরণ চৌধুরী	বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮।১২।৫৪০ পৃ.	ঐ
হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	বৈষ্ণব ইতিহাস, পৃ. ৪৩	ঐ
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৯৬	ঐ
মুরারিলাল অধিকারী	বৈষ্ণব দিগ্ দর্শিনী, পৃ. ৯০	ঐ

১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, ১৪২৯ শকে তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। বৃন্দাবন দাসের মতে শ্রীচৈতন্যের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর। উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মত মানিয়া লইতে হইলে বলিতে হয় যে নারায়ণীর তিন বৎসর বয়সে ছেলে হইয়াছিল।

২। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন—বৃন্দাবন দাস ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার জন্ম হইলে অন্ততঃ ষোল বৎসরের পূর্বে তাহার দীক্ষা হইতে পারে না। ১৪৭৫ শক পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও নিত্যানন্দ বাঁচিয়া ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। নিত্যানন্দ বার বৎসর বয়সে সন্ন্যাসীর সহিত গৃহত্যাগ করেন।

> হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
> নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
> তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
> তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥—১।৬।৬৬

অর্থাৎ নিত্যানন্দের বয়স যখন ৩২, বিশ্বম্ভরের বয়স তখন ২৩ বৎসর; ১৪৩০ শকে নিত্যানন্দের বয়স ৩২ বৎসর হইলে, ১৪৭৫ শকে তাঁহার বয়স হয় ৭৭। এত বৃদ্ধকাল

পর্যন্ত নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন না বলিয়া ক্ষীরোদবাবুর নির্দিষ্টকাল গ্রহণ করা যায় না।

৩। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম সং, পৃ. ১৯৩)—.৪২৯ শক ; (৫ম সং, পৃ. ৩০৯) ১৪৫৭ শক। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণের মতের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, ডক্টর সেনের উভয় মত সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

৪। শ্রীসুকুমার সেন—(বঙ্গশ্রী, আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ. ৩২৬)—ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে অর্থাৎ তাঁহার মতে ১৫০৭ হইতে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর বয়স তিন বৎসর ; ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ বৎসর। অতএব উভয় তারিখই অসম্ভব।

৫। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, "মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয়।" তাহা হইলে ৮।৯ বৎসর বয়সে নারায়ণীর সন্তান হওয়া স্বীকার করিতে হয়।

বর্তমান নবদ্বীপ রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল ও নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়া হইতে দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে মামগাছী গ্রাম। সেইখানে নারায়ণীর সেবাপাট আছে। জনপ্রবাদ যে ঐ সেবা বাসুদেব দত্তের স্থাপিত। অনুমান হয়, বাসুদেব দত্ত নারায়ণীর উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া সমাজ পরিত্যক্তা বিধবার ভরণ পোষণের উপায় করিয়া দেন। বৃন্দাবন দাস বাসুদেব দত্তের কারুণ্যের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, এরূপ আর অন্য কোন ভক্তের করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের গৌড় ভ্রমণ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বাসুদেব দত্তের প্রশংসা সবিস্তারে উচ্ছ্বসিত স্বরে করিয়াছেন ; যথা—

'জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত। সর্বভূতে কৃপালু চৈতন্য রসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী-অদোষ-দরশী সভা প্রতি। ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥

—৩।৫।৪৪৬

'জগতের হিতকারী' ও 'অদোষ-দরশী' বিশেষণ দেখিয়া অনুমান হয়, বৃন্দাবন দাস এখানে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। মামগাছীতে বৃন্দাবন দাসের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

আকর : ['শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান', ২য় সং, পৃ. ১৮০-৭]

পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ

প্রমথ চৌধুরী

আমার বিশ্বাস, নবাবি আমলের বঙ্গ সাহিত্যের অন্তর থেকে অনেক ছোটখাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা যায়।

চৈতন্য চরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যে অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনা যে প্রকৃত, কবিকল্পিত নয়, এই আমার চিরকেলে ধারণা। ··আমরা যদি সে যুগের ইতিহাসের অন্তর থেকে পাঠান-বৈষ্ণব বিজুলি খাঁকে বার করতে পারি, তাহ'লে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত বিবরণ যে সত্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

আমি সংক্ষেপে এবং যতদূর সম্ভব কবিরাজ' মহাশয়ের জবানিতেই ব্যাপার কি হয়েছিল বলবার চেষ্টা করব। কারণ ঘটনাটি না জানলে তার বিচার পাঠকদের মনে লাগবে না। ঘটনাটি অদ্ভুত হলেও যে মিথ্যা নয়, এবং একেবারে বিচার-সিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য, তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। সকলেই মনে রাখবেন যে, ঐতিহাসিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অতীতে যা একবার ঘটেছিল, তা পৃথিবীতে আর দু'বার ঘটে না। ইংরেজিতে যাকে বলে historical fact, তার repetition নেই। আর যে জাতীয় ঘটনা বারবার ঘটে এবং ঘটতে বাধ্য, সেই জাতীয় ঘটনা নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা যাকে প্রমাণ বলি, তা অনুমান মাত্র।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন-অঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণ করে দেশে যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন একদিন পথশ্রান্তি দূর করবার জন্য একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গী ছিল তিনটি বাঙালি শিষ্য আর দুটি হিন্দুস্থানী ভক্ত; একজন রাজপুত অপরটি মাথুর ব্রাহ্মণ। এ দুই ব্যক্তিকেই তিনি মথুরাতে সংগ্রহ করেছিলেন! তিনি গাছতলায় বসে আছেন, এমন সময়—

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈল॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইয়া॥

যবে সেই পাঠানে পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া কাঁপিতে লাগিল॥

বাঙালী তিনজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন দেখে মহাপ্রভুর হিন্দুস্থানি ভক্ত দুজন তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কারণ—

কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়॥

সেই 'মুখে বড় দড়' ব্রাহ্মণ পাঠান আসোয়ারদের বললেন—

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্ছিত।
অবাঃ চেতন পাব হইব সংবিত॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে॥

একথা শুনে

পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিনজন॥

বাঙালি বেচারারা ভয়ে কাঁপছে, তার থেকে প্রমাণ হল তারাই মহাপ্রভুকে খুন করেছে। একালেও আদালতে demeanour থেকে অপরাধের প্রমাণ হয়। সুতরাং সে তিন বেচারার হাতে হাতে প্রাণদণ্ড দেওয়াই স্থির হল। এক্ষেত্রেও উক্ত গোবেচারাদের প্রাণরক্ষা করলেন সেই নির্ভীক রাজপুত বৈষ্ণব।

কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুরুকী আছে দুইশত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান মনে সংকোচ বড় হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥

এরপর পাঠানদের মধ্যে যে একজন পীর ছিলেন, তার সঙ্গে মহাপ্রভুর শাস্ত্রবিচার শুরু হয়, এবং সে বিচারে পরাস্ত হয়ে পীরসাহেব মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং

রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলিখান॥
অল্পবয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥

এই হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পীর ও প্রভুর শাস্ত্রবিচারের পরিচয় পরে দেব ; কারণ সে বিচার অতি বিস্ময়জনক। তারপর কি কারণে রাজকুমার বিজুলি খাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করি তা বলব। প্রথমে এরকম ঘটনা ঘটা যে সম্ভব তাই দেখাবার জন্য দেশকালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন-অঞ্চলে তীর্থভ্রমণে যান তখন সিকন্দর লোদি দিল্লীর পাতশা, এবং আগ্রা ছিল তাঁর রাজধানী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরলোদির মৃত্যু হয়। সুতরাং চৈতন্য চরিতামৃতের উল্লিখিত ঘটনা সম্ভবতঃ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে।

সিকন্দর লোদি ছিলেন হিন্দুধর্মের মারাত্মক শত্রু। উক্ত পাতশার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথা-ক'টি হতে পাওয়া যাবে—

The greatest blot on his character was relentless bigotry. The wholesale destruction of temples was not the best method of conciliating the Hindus of a conquered district.

চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন সেদেশে যে দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসলীলা চলছিল, তা চৈতন্য চরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হতেই জানা যায়। মহাপ্রভু অতিকষ্টে গোপালজির দর্শনলাভ করেন। কারণ—

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপূত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলি গ্রামে থুইল॥
বিপ্র গৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥

পূর্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক সিকন্দর লোদি সম্বন্ধে আরও বলেন যে—

The accounts of his conquests resemble those of the protagonists of Islam in India, Sikandar Lodi's mind was warped by habitual association with theologians.

পাঠান বীরপুরুষেরা প্রথম যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁরা যেভাবে হিন্দুর মন্দির-মঠ-দেবদেবীর উপর যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তার পাঁচ শ বৎসর পরে পাঠান রাজ্যের যখন ভগ্নদশা, তখন আবার পাঠান পাতশারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নবজেহাদ প্রচার করেন কেন? যেকালে সিকন্দর লোদি বৃন্দাবন অঞ্চলে দেব মন্দিরাদি ধ্বংস করেন, ঠিক সেই একই সময়ে গৌড়ের পাতশাহ হুসেন শাহও—

উড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কতকত করিল প্রমাদ॥ [চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়]

এই সময়েই হিন্দুধর্ম নূতন প্রাণ পায়। তাই উক্ত ধর্মের প্রতি পাতশাদের মনে নববিদ্বেষও জাগ্রত হয়। এই নবহিন্দুধর্ম নবরূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়! জ্ঞান-কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্ম একমাত্র ভক্তিপ্রধান হয়ে ওঠে। 'শুষ্ক জ্ঞান' ও 'বাহ্যকর্মের' ব্যবসায়ীদের, অর্থাৎ হিন্দুসমাজের ধর্মযাজকদের ও বেদান্তশাস্ত্রীদের, যে এই ভক্তিধর্মের প্রতি অসীম অবজ্ঞা ছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাতায় পাতায় আছে।

অপরপক্ষে মৌলবিদের অর্থাৎ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রীদের বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে, এই প্রবল ভক্তির স্রোতে অনেক মুসলমানও হয়তো ভেসে যাবে, এবং আমার বিশ্বাস, এই শাস্ত্রীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই সেকালের মুসলমান পাতশারা এই নবহিন্দুধর্মের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। অন্ততঃ সিকন্দর লোদির মন তো was warped by habitual association with theologians।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল সেকালের জনৈক ব্রাহ্মণের নবধর্মমত প্রচার করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। Cmbridge History of India থেকে উক্ত ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

Sikandar had an opportunity while at Sambul of displaying the bigotry which was a prominent feature of his character. A Brahman of Bengal cxcited some interest and, among precisions, much indignation, by publicly maintaining that the Mahomedan and Hindu religions were both true, and were but different paths by which God might be approached. A'zam-i-Humayun, governor of Bihar, was directed to send the daring preacher and two rival dcctors of Islamic law to court, and theologians were summoned from various parts of the Kingdom to consider whether it was permissible to preach peace. They decided that since the Brahman had admitted the truth of Islam, he should be invited to embrace it with the alternative of death in the event of refusal. The decision commended itselt to Sikandar and the penalty was exacted from the Brahman, who refused to change his faith.

এ বাঙালি ব্রাহ্মণটি যে কে জানিনে। কিন্তু তাঁর সমকালবর্তী কবীরের মতও ঐ, চৈতন্যেরও তাই। চৈতন্যের শিষ্য যবন হরিদাসের যখন গৌড়ের 'বাদশার দরবারে' বিচার হয়, তখন হরিদাসও ঐ একই মত প্রকাশ করেন, এবং বাংলার ও আগ্রার মৌলবিদের মতে যে it was not permissible to preach peace, তার কারণ

তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে উক্ত ধর্মের প্রশ্রয় দিলে কোনো কোনো পাঠানও এই নববৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হবে, যেমন বিজুলি খাঁ পরে হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, আদিতে এই বৈষ্ণবধর্ম একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ছিল না। পূর্বোক্ত বাঙালি ব্রাহ্মণ যেমন স্বধর্ম ত্যাগ না করেও মুসলমান ধর্মের অনুকূল হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস কোনো কোনো পাঠানও তেমনি স্বধর্ম ত্যাগ না করেও পরম ভাগবত হয়েছিলেন এবং বিজুলি খাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। যে অবস্থায় ও যে কারণে মহাপ্রভুর দলবল পথ-চলতি তুরুখ-সোয়ারদের হাতে গ্রেপ্তার হন, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সূত্রে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলেছেন যে—

সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে তা'তে লোকে কহে পীর॥

এই পীরের সঙ্গে মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচার করে তাঁকে স্বমতাবলম্বী করেন। পরে পাঠান রাজকুমার বিজুলি খাঁও স্বীয় গুরুর পদানুসরণ করেন। এই শাস্ত্রবিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব, কারণ এই বিচার অদ্ভুত। সেই পীরের

চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুরে দেখিয়া

এবং সে

নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিলা খণ্ডন॥

মুসলমান পীর যে শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী, একথা কি বিশ্বাস্য? তারপর মহাপ্রভুর উত্তর আরও আশ্চর্য। তিনি বললেন—

তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্বপর বিধিমধ্যে পর বলবান॥···
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপ নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেঁহো শ্যামকলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণ ব্রহ্মরূপ।
সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদিস্বরূপ॥

মহাপ্রভুর মুখে একথা শুনে পীর উত্তর করলেন যে—

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন বস্তু নারি নির্ধারিতে॥···
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥

এই কথোপকথন আমাদের বড়ই আশ্চর্য ঠেকে; কারণ মুসলমান ধর্মের God যে personal God, বহু দেবতাও নয়, এক নির্গুণ পরব্রহ্মও নয়, একথা আমরা সকলেই

জানি। সুতরাং কোনো পরমগম্ভীর মুসলমান পীরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মহাপ্রভুর পক্ষে আবশ্যক হয়েছিল, এ কথাটা প্রথমে নিতান্তই আজগুবি মনে হয়। কিন্তু যাঁদের মুসলমান ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে, কালক্রমে মুসলমান ধর্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায় জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, এবং কোনো ধর্মেরই জ্ঞানমার্গীবা সগুণ ঈশ্বর অস্বীকার করে না। উক্ত পীর যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তা তাঁর পরিধানের কালো বস্ত্র থেকেই বোঝা যায়। সুফীদের সাম্প্রদায়িক বেশ স্বতন্ত্র। সুতরাং পীর মহাশয় সুফী নন। তবে তিনি কি? যাঁরা মুসলমান ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলতে পারেন।

তারপর আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মহাপ্রভুর মুসলমান শাস্ত্রের বিচার। শ্রীচৈতন্য যে মহাপণ্ডিত ছিলেন তা আমরা সকলেই জানি। তবে তিনি যে আরবি শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন, একথা কারও মুখে শুনিনি। তবে এ বিচারের কথাটা কি আগাগোড়া মিথ্যা? আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, সেযুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিত মহলে শাস্ত্রবিচার চলত, এবং হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতের আসল কথা সব জানতেন। সিকন্দর লোদি গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দরবারে জনৈক বাঙালি ব্রাহ্মণের সহিত মৌলবিদের শাস্ত্র বিচারের বৈঠক বসান। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় তো মহাপ্রভু যে মুসলমান শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হন, একথা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।

কবিরাজ গোস্বামীর এসব কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা মূলতঃ সত্য, তাহ'লে এই প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভু যেমন পুরীতে সার্বভৌমকে, কাশীতে প্রকাশানন্দকে, জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন, তেমনি তিনি সৌরক্ষেত্রে জনৈক পরমগম্ভীর অদ্বৈতবাদী মুসলমান পীরকেও ভগবদ্‌ভক্ত করে তুলেছিলেন, এবং একমাত্র কোরাণের দোহাই দিয়ে। এবং তিনি পূর্বেও যেমন হিন্দু শাস্ত্রীদের নিকট মুসলমান ধর্মপ্রচার করেননি, এক্ষেত্রেও তেমনি তিনি মুসলমান শাস্ত্রীর নিকট হিন্দুধর্মপ্রচার করেননি। কিন্তু উভয় ধর্মমতেরই যা greatest common measure, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি, তারই মর্মব্যাখ্যা করেছিলেন। মানুষে যাকে ধর্মমনোভাব বলে, তার প্রাণ যে ভগবদ্‌ভক্তি, এ জ্ঞান যার আছে, তার অন্তরে নানাধর্মের ভেদজ্ঞানটাই অবিদ্যা। আমার বিশ্বাস, সেযুগে ভগবদ্‌ভক্ত ও বৈষ্ণব এ দুটি পর্যায় শব্দ ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের মত পাঠানও স্বধর্মরক্ষা করেও পরম বৈষ্ণব অর্থাৎ পরম ভাগবত হতে পারত।

বিজুলি খাঁ নামক যে একটি স্বতন্ত্র পাঠান রাজকুমার ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের মথুরার সন্নিকটে দেখা হয়েছিল। Tabakat-i-Akbari নামক ফারসি গ্রন্থে তাঁর নামধাম এবং তাঁর বাপের নামও পাওয়া যায়। আকবর কর্তৃক কালিঞ্জর-দুর্গ আক্রমণ সূত্রে গ্রন্থকার বলেন যে—

This is a strong fortress, and many former Sultans had been ambitious of taking it. Sher Khan Afghan (Sher Shah) besieged it for a year, but was killed in the attempt to take it, as has been narrated in the history of his reign. During the interregnum of the Afghans, Raja Ram Chundar had purchased the fort at a high price from Bijilli Khan, the adopted son (Pisan--Khwanda) of Bihar Khan Afghan. [Elliot's History of India, Vol I. p. 333]

এর থেকে জানা যায় যে, রাজকুমার বিজুলি খাঁ কালিঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র, এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রি ক'রে চলে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে। তবে তিনি যে কবে কালিঞ্জর-রাজ্য ত্যাগ করেন তার তারিখ আমরা জানিনে, সম্ভবতঃ তাঁর পিতা বিহারি খাঁ আফগানের মৃত্যুর পর তিনি যখন স্বয়ং নবাব হন। শের শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছিল ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, বিজুলি খাঁ খুব সম্ভবতঃ এর পরেই কালিঞ্জর হস্তান্তর করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর অল্প বয়েস, সুতরাং রাজা রামচন্দ্রকে তিনি যখন কালিঞ্জর-দুর্গ বিক্রি করেন, তখন তাঁর বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিজুলি খাঁ কালিঞ্জরের নবাব হওয়া সত্ত্বেও যে পরম ভাগবত ব'লে গণ্য হয়েছিলেন, এ ব্যাপার অসম্ভব নয়। বৌদ্ধযুগের বড় বড় রাজা মহারাজারাও পরমসৌগত ব'লে গণ্য হতেন। তাছাড়া, এ নববৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করবার প্রয়োজন ছিল না। ভোগে অনাসক্ত হলেই বৈষ্ণব হওয়া যেত। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে এই কথা বলেই তাঁকে সংসার ত্যাগের সংকল্প হতে বিরত করেন।

মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস করেছিলেন, কিন্তু অপরকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কখনও উৎসাহ দেননি। এমন কি, বালযোগী অবধূত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর ধর্মত্যাগ করে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন।

এইসব কারণে আমার বিশ্বাস যে চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি অন্ততঃ চৌদ্দ আনা সত্য, অতএব ঐতিহাসিক।...

[প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৮]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে ষোড়শ শতকে বাংলায় এক অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। · চৈতন্যের পূর্বেও যে এই বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও চণ্ডীদাসের 'পদাবলী' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চৈতন্যের জন্মের অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ জন শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবপুরী ও অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যের পূর্বে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। 'চৈতন্য ভাগবতে' এ সম্বন্ধে চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বেকার নবদ্বীপের অবস্থা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ·
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্তু,
না বাখানে যুগ-ধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন ॥
গীতা ভাগবত যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ ··

তবে হরিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবদ্বীপে ছিলেন—তাঁহাদের অগ্রণী অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিয়া নিতান্ত দুঃখ পাইতেন। চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার দুঃখ দূর করিলেন।

বৈষ্ণবগণের মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ (প্রপত্তি) ইহাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা। কিন্তু এই নিষ্কাম ভক্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্যভাবের প্রতীক কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ও রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্যের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। · কিন্তু এ প্রেম দিব্য ও দেহাতীত। ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা।

শ্রীচৈতন্য নিজে কোন তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বৃন্দাবনবাসী ছয়জন গোস্বামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোস্বামীর নাম—রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট।···তাঁহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে 'হরিভক্তিবিলাস' ও 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' নামক দুইখানি গ্রন্থে। ··

কিন্তু এই সমুদয় শাস্ত্ররচনার পূর্বেই চৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত দিব্য প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধাকৃষ্ণের আদর্শানুযায়ী ভগবদ্‌ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গ সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল—রাধাকৃষ্ণের লীলা ও হরিনাম কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বন্যায় যেন ডুবিয়া গেল। ইহাতে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারের এবং জাতিভেদের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না। স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং আচণ্ডাল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের মনে ভগবৎপ্রেম ও সাত্ত্বিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল চৈতন্যের আদর্শ ও লক্ষ্য।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের পূর্বেও এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা বহুল পরিমাণে সাত্ত্বিক ভাবশূন্য হইয়া নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল।··· এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণবধর্মকে এক অতি উচ্চস্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য অনুভূতি প্রাণোন্মাদকারী কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা ধুইয়া ফেলিল।···

এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতন্যের আদর্শে ও দৃষ্টান্তে বাঙালী হিন্দু যেন এক নবীন জীবন লাভ করিল। পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণনাম করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌরুষের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন মধ্যযুগে তাহার তুলনা মিলে না। নবদ্বীপের মুসলমান কাজীর হুকুমে যখন চৈতন্যের প্রবর্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্তনীয়াদের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রস্তাব করিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবাসী কেহ কেহ খুশি হইয়া বলিলেন, "এইবার নিমাইপণ্ডিতের দর্পচূর্ণ হইবে—বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এইরূপই শাস্তি হয়।" কিন্তু চৈতন্য দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিলেন, কাজীর আদেশ অমান্য করিয়া এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব।

"ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীর্তন করিব দেখি কোন্ কর্ম করে॥
তিলার্ধেকে ভয় কেহ না করিও মনে।"

তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী ধর্মরক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল। চৈতন্য কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু বিশাল জনসমুদ্র মার মার কাট কাট শব্দে তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাইল এবং সংকীর্তন নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল।

চৈতন্যের আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভক্ত

বৈদ্য চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে যে দেবমূর্তি ছিল তাহা স্বর্ণনির্মিত মনে করিয়া যবন সৈন্য তাহা কাড়িয়া নিতে আসিল।—

"বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিল॥"

কিন্তু চৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাস্য ও মাধুর্যভাবেই বিভোর ছিলেন—পৌরুষকে মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদের হাতে চৈতন্যের আদর্শের কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল কাজীর সহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সমসাময়িক চৈতন্যচরিতকার বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে (মধ্য ২৩) বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। চৈতন্যের আদেশে তাঁহার অনুচরেরা যে কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের দাসবৃত্তিসুলভ মনোভাবের সহিত চৈতন্যের এই 'উদ্ধত' ও 'হিংসাত্মক' আচরণ সুসঙ্গত হয় না—সম্ভবত কতকটা এই কারণে এবং কতকটা মুসলমান রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্যের জীবনের এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে প্রাধান্য দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন। সমসাময়িক বৃন্দাবনদাস ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী—কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব লিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে[১] চৈতন্যের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে। সুতরাং যদিও বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি মুরারি গুপ্ত এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী চৈতন্য-চরিতকার কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্যের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র দুইটি ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পরে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে বসিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। তখন আকবরের রাজ্য কেবল শেষ হইয়াছে। সুতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়া মুসলমান সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা, তাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে হীন দাস্যভাবের মহিমা পৌরুষের স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব তিনি লিখিয়াছেন যে, এই হিংসাত্মক ব্যাপারে চৈতন্যের কোন হাত ছিল না, ইহা কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকের কাজ। চৈতন্য কাজীকে ডাকাইয়া আনিলেন। বিনম্র বচনে "প্রভু কহে—এক দান মাগি হে তোমায়।
সংকীর্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥"

১. নসরৎ শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাজীর ঘটনা সংক্ষেপে বলিয়া তারপর লিখিয়াছেন :—

"বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে॥ (চৈ. চ. আদি ১৭)

অথচ তাঁহার মতে চৈতন্য কাজীর ঘর ও বাগান ধ্বংস করার আদেশ দেন নাই। চৈতন্যের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অনুমতি ভিক্ষা, স্বপ্ন দর্শনে কাজীর ভয় ও তজ্জন্য কীর্তনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কাজীর বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণদাসের অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতন্যভাগবতে নাই। সমসাময়িক বৃন্দাবনদাস ও প্রায় শতবর্ষ পরে বৃন্দাবনের গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যের জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ধারণা কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই চৈতন্য যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসর বাংলার বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের কেবল একটি মূর্তিই ধ্যান ও ধারণা করিয়াছেন—কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুণ্ঠিত ধূলি ধূসরিত দেহ। কিন্তু তাঁহার যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পূত চরিত্র ভক্তের সামান্য নীতিভ্রষ্টতাও ক্ষমা করেন নাই এবং যিনি দুরাচারী যবনকে শাস্তি দিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন "নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন"—বাঙ্গালী তাহা মনে রাখে নাই। বাংলার পরাক্রান্ত সুলতান হোসেন শাহের রাজ্যে মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তিনি যে সাহস ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙ্গালী তাহা অচিরেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

বস্তুত চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ আদি আচণ্ডালে প্রেমভক্তি দান করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবধূত নিত্যানন্দকে পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। বলিলেন, "তুমি যদি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কর, তবে মূর্খ, নীচ, দরিদ্র, পতিতকে আর কে উদ্ধার করিবে"। ইহার ফলে জাতিভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের যে সমুদয় শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবনযাপন করিতেছিল তাহাদের এক বড় অংশ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাঁহার সহচর ও অনুবর্তীদের প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অন্তত আংশিক পরিমাণে রহিত হইয়াছিল।

চৈতন্য যে আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান বাদ দিয়া স্ত্রীপুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। বহু শূদ্র এবং খুব অল্প সংখ্যক হইলেও মুসলমানরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিল। জাতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের যবন সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির

সঙ্গেও কীর্তনে 'যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম'। ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। রঘুনাথ দাস কায়স্থ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া শূদ্র ও অন্যান্য নীচ জাতীয় বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগ দিতেন।

কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশি তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নূতন ভাবে নানাবিধ কলুষতার আবির্ভাব হইল।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান যুগের ভাষায় পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই পরকীয়া প্রেম যে স্বকীয়া প্রেম অর্থাৎ পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ ইহা বাংলার বৈষ্ণব সমাজেও গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা এই মত খণ্ডন করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা নানাদেশে স্বকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া অবশেষে বাংলাদেশে আসিলেন। ছয় মাস বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী ভজন প্রভৃতি এমন নানাপ্রকার অনুষ্ঠান বাংলায় প্রচলিত ছিল, সুরুচি লঙ্ঘন না করিয়া তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াছিল।

কিন্তু কেবল এই এক বিষয়েই চৈতন্যদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতিভেদের কঠোরতা দূর করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, এক শতাব্দীর বেশি তাহা স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের মতে কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক উচ্চ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক ভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন বাংলাদেশে ইহাদের পূর্বেই চর্যাপদে

তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবও এই প্রকার সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন—তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন ধর্ম ও আচারের সহিত যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতন্যের পরবর্তীকালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার উপাসকেরা শাস্ত্রোক্ত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান বর্জন পূর্বক কেবলমাত্র গুরুর নির্দেশে অথবা স্বীয় অন্তরের অনুভূতি জাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত।··

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত—যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, কিশোরীভজনী, রামবল্লভি, জগন্মোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাখায় সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। ঘোষ পাড়া, রামকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, খড়দহ, কেন্দুলি এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়াদের বহু কেন্দ্র আছে।· কর্তাভজা সম্প্রদায় আউলচাঁদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে নৈহাটির নিকট ঘোষপাড়া নিবাসী সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই তাঁহার শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইষ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। এই দলের মধ্যে নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কৃষ্ণকে যেমন ভাবে কায়মন প্রাণে ভজন করিত ইহারাও সেইরূপ করিত।· ঊনবিংশ শতাব্দীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামদুলাল পালের অধ্যক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু ঐ যুগের নীতির আদর্শ অনুসারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহার ফলে এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

'স্পষ্টদায়ক' সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাঁহার কর্তৃত্বও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদ নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য রূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভজা দলের ন্যায় ইহারও বহু সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্য ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর হাতে। ইহারা একসঙ্গে এক মঠে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও চৈতন্যের স্তুতিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত।· কলিকাতাই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

'সখীভাবক' সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তেরা স্ত্রীলোকের পোষাক পরিত, স্ত্রীলোকের নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নামে নৃত্যগীত করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তিজনক ও অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তরা যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও হিন্দুর প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এক উদার বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি, বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনতিপূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং বাংলার এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় সুফী প্রভাবের ফল নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ সরোরুহপাদের (অর্থাৎ সরহ-পাদের) 'দোহাকোষ' নামক গ্রন্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি।

'ধর্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জ্ঞানলাভ হইবে না।'·· 'ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল। যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া?'···'বেদ কেবল বাজে কথা বলে।' ··'সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।'···

এই সমুদয় উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য গুরুতর। প্রচলিত সংস্কার আচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেসাঁসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর এই সাধনার ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব সহজিয়াদের অনুরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। ··চৈতন্যের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে ইসলামের কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।··· চৈতন্য ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা দ্বারাই অল্প বা বেশি পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অন্য কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই।

আকর : বাংলাদেশের ইতিহাস [মধ্যযুগ]

উড়িষ্যার পতনে চৈতন্য আন্দোলনের দায়িত্ব

প্রভাত মুখোপাধ্যায় (ভুবনেশ্বর)

ইতিহাসে কতকগুলি মুখরোচক থিয়োরী আছে যা সহজে দূর হতে চায় না। এরকম একটি থিয়োরী—চৈতন্য এবং তাঁর নববৈষ্ণবীয় আন্দোলনই উড়িষ্যা সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর History of Orissa গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—'সহসা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে উড়িষ্যায় অধিবাসীদের সামরিক উদ্দীপনা হ্রাস পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার ক্ষমতা ও মর্যাদারও অবনমন দেখা গেল। বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু চৈতন্যের এদেশে দীর্ঘকাল বসবাসের সঙ্গে এই অবনতির একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।'

'একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উড়িষ্যা ও ওড়িশীদের রাজনৈতিক পতনের অন্যতম প্রধান কারণ চৈতন্য। এই বৈষ্ণব বা নববৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করাই ছিল প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর ২৮ বৎসর পর মুসলমান কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের প্রকৃত কারণ। ·· দেশময় একটা ধর্মীয় উদ্দীপনার ঢেউ জাগিয়াছিল এবং এই ধর্মীয় সংস্কারের পর্বেই উড়িষ্যা তাহার সাম্রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক মর্যাদাও হারাইল!'

'উড়িষ্যায় রাজা এই ধর্মগ্রহণ করায় প্রতাপরুদ্রের ক্ষমতাশালী রাজপুরুষদের মধ্যেও এই নববৈষ্ণবধর্মের হাওয়া লাগিল, রাজার পরে পরে যাঁহারা এই নবধর্মে দীক্ষিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—রাজমহেন্দ্রীর পতনের পূর্বে উহার রাজ্যপাল রামানন্দ রায় এবং মূলজ্যাঠা দণ্ডপাট বা মেদিনীপুরের রাজপ্রতিনিধি গোপীনাথ বরজেনা [পৃ. ৩২৯-৩৩১]।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যার রাজনৈতিক ইতিহাসে নববৈষ্ণব আন্দোলনের কুফল সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথার অর্থ হল, ওড়িশীদের ক্ষমতা মর্যাদা সামরিক উদ্দীপনা সব কিছুরই হঠাৎ পতন হল ১৫১০ সালের পর, এবং চৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলন এই পতনের কারণ। এ যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের আকস্মিক রাহুগ্রাস।

কিন্তু এ পতন হঠাৎ আসেনি, এসেছে ধীরে ধীরে; এমন কি ষোড়শ শতকের আগেই এই অবনতি লক্ষ্য করা যায়। পুরুষোত্তম তাঁর সিংহাসনারোহণের পাচ ছ' বছরের মধ্যেই তাঁর পূর্বপুরুষ অধিকৃত রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি ভূখণ্ড হারিয়ে ফেলেন। বাহমনী সুলতানেরা গ্রাস করেন গোদাবরী-কৃষ্ণা-দোয়াব এলাকা। বিজয়নগরের সালুভ নরসিংহ গজপতি রাজাদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই পুরুষোত্তম শত্রু-অধিকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

১৪৮১ সালে প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি ও রাজনীতিক মামুদ গাওয়ান নিহত হওয়ায় দক্ষিণ ভারতে পঁচিশ বছরের মত মুসলিম তৎপরতা বন্ধ রইল। শেষ 'প্রকৃত সুলতান' তৃতীয় মহম্মদ শাহ্ ১৪৮২ সালে মারা গেলেন, এবং পুরুষোত্তম অনায়াসেই মহম্মদ শাহের অযোগ্য উত্তরাধিকারী মামুদ শাহের (১৪৮২-১৫১৮) হাত থেকে দোয়াব অঞ্চল জয় করে নিলেন। বাহমনী সাম্রাজ্যের ভাঙন দশায় গজপতি রাজারা দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা থেকে আর কোন বড় ধরণের চাপের সম্মুখীন হননি।

বিজয় নগরে সালুভ নরসিংহের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা কোন রকমে ১৫০৫ সাল পর্যন্ত তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তারপর বিজয়নগরে তুলুভ বংশীয় মন্ত্রী বীর নরসিংহ নায়ক এক নতুন রাজবংশের পত্তন করলেন।

বাংলাদেশেও অনুরূপ বিশৃঙ্খলা চলছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ কয়েকজন দুর্বল শাসকের রাজত্বে প্রাসাদের আবিসিনীয় প্রহরীদের হাতেই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং এরপরই অল্প কিছুদিনের জন্য চলল হাব্সী শাসন। ১৪৯৩ সালে আমীর ওমরাহরা সৈয়দ হুসেন শাহকে সুলতান রূপে মনোনীত করলে বাংলায় এই হাব্সী শাসনের অবসান হয়।

প্রতাপরুদ্র যখন ১৪৯৭ সালে সিংহাসনে বসলেন, তখনও উড়িষ্যার রাজনৈতিক আকাশে মেঘ দেখা দেয়নি। প্রতাপরুদ্রের উচিত ছিল বিজয়নগর ও বাহমনী সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেওয়া। গৌড়ের সিংহাসনে হুসেন শাহ তখন পর্যন্ত খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেননি। কিন্তু প্রতাপরুদ্রের নিষ্ক্রিয়তা শত্রুদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হল।

১৫১০ সালে বিজয়নগরে স্বনামধন্য কৃষ্ণদেব রায় সিংহাসনে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ছোটখাট উপদ্রব সুরু হল এবং গজপতি প্রতাপরুদ্রকে ছুটতে হল নেল্লোর জেলার উদয়গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা রক্ষা করতে। কাজেই, ১৫১০ সালে মহাপ্রভু যখন প্রথম উড়িষ্যায় এলেন, তখন রাজা পুরীতে ছিলেন না (চৈতন্য ভাগবত, ৩।৩)।

উড়িষ্যার বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের বিজয় অভিযান সুরু হয় ১৫১৩ সালে। ১৫১৪ তিনি উদয়গিরি অবরোধ করেন। ১৫১৫ সালে গুণ্টুর জেলায় কোণ্ডবীড়ু অবরুদ্ধ হয়। তিনি রাজপুত্র বীরভদ্রকে কারারুদ্ধ করেন এবং ১৫১৫ সালে সিংহাচলম্ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন (Historical Inscriptions of South India—Sewel & Aiyangar, পৃ. ২৪০)। অপমানজনক শর্তে সন্ধি করা ছাড়া গজপতির উপায়ান্তর রইল না। সম্ভবতঃ এ সময় তিনি গোদাবরীর দক্ষিণ অঞ্চল ছেড়ে দেন এবং কৃষ্ণদেবের সঙ্গে নিজের কন্যা জগমোহিনীর বিবাহ দেন।

এদিকে হুসেন শাহ কিন্তু গজপতির অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে কসুর করেননি (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ৬।১৪)। ১৫০৯ সালে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং অসংখ্য মূর্তি ধ্বংস করেন (চৈতন্য ভাগবত, ৩।২-৪)।

'অমর সুরথান (আমীর সুলতান) জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণের মূর্তিগুলি বিকলাঙ্গ

করলেন। দক্ষিণের শিবিরে বসে এ খবর পেয়ে গজপতি পুরীর দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি আসায় সুলতান পিছু হটে গেলেন' (—মাদলা পঞ্জী)। কাবালি তাম্রফলকে সুলতানের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের ১৪৩২ শকাব্দের (১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের) এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, সুলতান এ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং তাঁর অধিকৃত উড়িষ্যার ভূখণ্ড সবটাই পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

মাদলা পঞ্জীর ওই বিবৃতি অনুসারে গজপতির পাত্র গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলতানের পক্ষে যোগ দেন। প্রতাপরুদ্র মর্মাহত হয়ে হুসেন শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের উপর তিনি রাজ্যভার দিলেন (তাহাঙ্ক মূলে রাজ্যভার ছেলে') এবং নিজে নামমাত্র রাজা হয়ে রইলেন।

আমরা এই বিবৃতিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। গোবিন্দের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ীর প্রাপ্য সুবিধা তিনি পাননি,—এ হতে পারে। কিন্তু মাদলা পঞ্জীর বিবৃতির শেষাংশ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। গৌড়ীয়া বা ওড়িয়া—সমকালীন বৈষ্ণব রচনার কোথাও উড়িষ্যার এই 'প্রকৃত' (de facto) শাসকের উল্লেখ নেই।

ফেরিস্তা বলেছেন, গোলকুণ্ডার কুলি কুতুব শাহ্ কোণ্ডবীড়ু ও সিংহাচলমের মধ্যবর্তী এলাকা জয় করে নেন। ভাগ্যদেবী এইভাবে পিতার (পুরুষোত্তমদেবের) উপর প্রসন্ন হলেও, পুত্রের (প্রতাপরুদ্রের) উপর বিরূপ হলেন। তিন দিক দিয়ে প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রতাপরুদ্র বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরক্ষা গড়ে তুললেন। পুরুষোত্তম ও কপিলেন্দ্রর আগ্রাসী যুদ্ধগুলিতে সামরিক শক্তি নিয়োগের পর এ সময় সামরিক ঢিলেমি দেখা দিল। কাঞ্চী থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে ওড়িশীরা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। এর পরিণতি সহজেই অনুমেয়। 'বিজয়নগরের ক্ষোদিত লিপিগুলিতে প্রমাণ আছে যে, গজপতি প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে শেষ পর্যন্ত ভাড়াটে মুসলমান সৈনিকদেরও নিয়োগ করেছিলেন' (History of Orissa, R. D. Banerjee, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৫)। উড়িষ্যাবাসীদের সামরিক বলবীর্যের এই শোচনীয় পতনের জন্য চৈতন্য আন্দোলনকে দায়ী করা চলে না। চৈতন্য পুরীতে প্রথম এসেছেন ১৫১০ সালে, ১৫২২ সালের আগে তিনি এখানে বসবাস করেননি। রাজার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ১৫১২ কি ১৫১৩ সালে। এটা মনে করা কঠিন যে, উদয়গিরি এবং কোণ্ডবীড়ুর পতন এই সাক্ষাৎকারের ফলেই ঘটেছিল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, প্রতাপরুদ্রের ক্ষমতাশালী রাজপুরুষেরা নববৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং তার ফলেই তারা রাজ্যের ব্যাপারে অবহেলা করেছিল। এ আংশিক সত্য। Nunez-এর মতে, রাজ্যের সমস্ত প্রধানেরাই কোণ্ডপল্লের অবরোধে জড়ো হয়েছিল। তারা যদি নববৈষ্ণবধর্মে তেমন উৎসাহী হত, আমরা তাদের দেখতে পেতাম পুরীতে। গোপীনাথ বরজেনার মত রাজপুরুষেরা নববৈষ্ণব ধর্মের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধাই দেখাত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রামানন্দ রায়ের আচরণের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'দেশের অরক্ষিত সীমান্তের শাসকের পদ থেকে পদত্যাগ করে রামানন্দ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং রামানন্দের পদত্যাগের পর কুমার বীরভদ্রের মত অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ রাজপুরুষের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার ফলেই বলা যায় কোণ্ডবীডু, কোণ্ডপল্লে ও রাজমহেন্দ্রীর পতন হল' [History of Orissa, Vol, p. 332]।

এই বিবৃতিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, রামানন্দ একজন সুযোগ্য প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁর অকালে পদত্যাগ দেশের পক্ষে বিপর্যয়কর হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি, রামানন্দ প্রশাসক হিসাবে ছিলেন ব্যর্থ। তিনি ছিলেন ধর্মতত্ত্বে পণ্ডিত, তুরীয়মার্গে তাঁর বিচরণ। প্রশাসকের পদে এ ধরনের মানুষ বেমানান।

বিশেষত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের লাগাম হাতে নেবার যোগ্যতা রামানন্দের মত ব্যক্তির ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গজপতির চারধারে ছিলেন রামানন্দ ও বীরভদ্রের মত অযোগ্য, গোপীনাথ বরজেনার মত দুর্নীতিপরায়ণ এবং গোবিন্দ বিদ্যাধরের মত দুর্বৃত্ত রাজপুরুষের দল।

প্রতাপরুদ্রের স্বপক্ষে একথা বলা উচিত যে তিনি সমস্ত দিক থেকে আক্রান্ত হয়েও রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকেও রেহাই দেন নি। তিনি জয়ানন্দের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, প্রতাপরুদ্র বঙ্গদেশ আক্রমণের ব্যাপারে চৈতন্যের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী (চৈতন্য) তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, এ যুদ্ধের ফলে তার নিজের দেশই বিধ্বস্ত হবে।

ঐতিহাসিক প্রবর একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে জয়ানন্দের কথাকে ভিত্তি করে বলেছেন যে; চৈতন্যের পরামর্শ শিরোধার্য করে এই 'ভীরু ধার্মিক রাজা' নিজরাজ্যের উপযুক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

মহাপ্রভুর নিজের কথাতেই জয়ানন্দের বিবৃতির বিরোধিতা আছে।
'চৈতন্য চরিতামৃতে' আছে—

'সার্বভৌম কহে, এই প্রতাপরুদ্র রায়। উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ। সার্বভৌম কহে কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন। স্ত্রী দরশনসম ইহা বিষের ভক্ষণ॥
(—মধ্য।একাদশ)

রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার। ছি ছি বিষয়ি স্পর্শ হইল আমার॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন। প্রসন্ন হইয়াছে তাঁরে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান। বাহে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান্॥
(—মধ্য।ত্রয়োদশ)

ইত্যাকার মন্তব্য করার পরে আবার চৈতন্য রাজার রাজনৈতিক পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করবেন—একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভু সাক্ষাৎকার প্রথম ঘটে ১৫১২ কি ১৫১৩ সালে। ১৫১৭ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। ১৫৪০ সাল

নাগাদ উড়িষ্যা রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা হয় গোদাবরী। উত্তরে রূপনারায়ণ নদীর পারে—'পিছল্‌দা' পর্যন্ত সীমানা এগিয়ে আসে। গোদাবরী থেকে রূপনারায়ণ পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের আর কোন অংশ শত্রুপক্ষ দখল করতে পারেনি। · স্পষ্টতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণধর্মে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও রাজা তাঁর রাজকীয় কর্তব্যে অবহেলা করেননি। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণদেব রায়ও ছিলেন বৈষ্ণব। কিন্তু ধর্মনীতি তাঁর আগ্রাসী যুদ্ধবিগ্রহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

একথাও সত্য নয় যে প্রতাপরুদ্র পুরোপুরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলেন। উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় (প্রাক্ চৈতন্য) বৈষ্ণবধর্ম তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন নি।··

উড়িষ্যা সাম্রাজ্যের পতনের আসল কারণ 'নববৈষ্ণব ধর্ম' গ্রহণ নয়, সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা। এটা প্রকৃতির নিয়ম, কোন বংশেই অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে না।··

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হয় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ২৮ বছরের মধ্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের কম করে সাতজন রাজা সিংহাসনে বসেন। কেন্দ্রীয় শক্তির এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্ত রাজারা, বিশেষতঃ ভঞ্জরা বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ এবং ক্ষমতার লড়াই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিল। গোবিন্দ বিদ্যাধর ভোই তাঁব প্রভু প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাঁর এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তাঁর পৌত্র নরসিংহকে। প্রধান সেনাপতি মুকুন্দদেব হরিচন্দন নরসিংহকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন।

এইসব বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন যাঁরা মাতৃভূমিকে বিক্রী করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুভঞ্জ ছোটরায় মহম্মদ খান সুরের সাহায্যে দু'বার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। দেশের চরম বিপদের কালে স্বর্ণগড়ের সেনাপতি মুকুন্দদেবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

চৈতন্যর ধর্ম আন্দোলন মানুষকে বিশ্বস্ত অনুগত ও সৎ হবার শিক্ষা দিয়েছিল। তার সঙ্গে এই লোভ হিংসা বিশ্বাসঘাতকতা, এই নীতি-ভ্রষ্টতার যোগ কোথায়? অনুরূপভাবে, চৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক শ' বছর আগে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন খলজীর হাতে নির্বীর্য্য বাংলার লজ্জাজনক পরাজয় ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে কোন ধর্ম আন্দোলনকে পতনের কারণ রূপে চিহ্নিত করা হয়নি।

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য লুপ্ত হল। দুর্বল উত্তরাধিকারী উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের নীতিভ্রষ্টতা এবং জাতির সামরিক দুর্বলতা এই পতনের কারণ; এর সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কোন যোগ নেই। চৈতন্য ধর্মের প্রচার না হ'লেও এ পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

কেনেডির চৈতন্য-আলোচনা ঃ প্রতিবাদ

সতীশচন্দ্র দে

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য ধর্মসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক *The Chaitanya Movement* by M. T. Kennedy M. A. প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের ধর্মকে খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত তুলনা করিয়া মানবের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি বিষয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম চৈতন্যদেবের ধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়াছেন—

১, ৬১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, গৌড়ে নিত্যানন্দের আচণ্ডালে ভক্তিবিতরণ চৈতন্যদেব পছন্দ করিতেন না। 'বাউলকে কহিও··'ইত্যাদি হেঁয়ালীর নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। কেনেডি সাহেব তাহার একটি পরিকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেনেডি সাহেব এই সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তি'র প্রতিবাদ করিয়াছেন: In his book 'Chaitanya and His Age', Dr. Sen argues eloquently for the view that Chaitanya himself was the guiding spirit in all the social measures undertaken by Nityananda in Bengal.

Nityananda was appointed by him to stay in Bengal with the sole charge of social reformation, Chaitanya had found the caste system eating into the vitals of the social fabric and he and his followers were determined to root out the evil from the land,

কেনেডি সাহেব বলেন, "It is hardly accurate to write of Chaitanya in terms of social reform or to credit him with revolutionary social reform. His sole interest was religion and it is only as his religious experience and that engendered by him among others, came into confiict with the Hindu social system that can be called a social reformer. His social reform was only a by-product of his Bhakti ·· Many sayings are attributed to Chaitanya which seem to transcend the caste system altogether, although the authenticity of all such teaching is not certain by any means.···The full consequences of Chaitanya's teaching form part of the history of the sect. It is probable that Chaitanya neither foresaw them nor was in full sympathy with the steps taken by some of his followers in carrying out the logical implications of his own teaching (p. 56-58)" অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার করিবার ইচ্ছা ছিল না। ধর্মসংস্কার করিতে যাইয়া তিনি বাধ্য হইয়া সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন।

আমরা ইহার উত্তরে বলি যে, হিন্দুরা ধর্মসংস্কার হইতে সমাজসংস্কার বিভিন্ন করিতে পারে না। হিন্দু ধর্মসংস্কার করিলেই হিন্দু সমাজসংস্কার হইতেই হইবে এবং হিন্দুসমাজসংস্কার হইলেই হিন্দুধর্মসংস্কার অবশ্যই হইবে। হরিদাস যবন, জাতি ভ্রষ্ট রূপ ও সনাতন, ভূঁইমালীর উচ্ছিষ্টভোজী কালিদাস প্রভৃতিকে সমাদর করিয়া, বৈদ্য শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ কর্মকার প্রভৃতি স্পৃষ্ট খাদ্য খাইয়া, শূদ্র রামানন্দ, জাতিভ্রষ্ট রূপ ও সনাতন প্রভৃতির নিকটে ধর্মশিক্ষা করিয়া, আচণ্ডালে ভক্তিবিতরণ করিয়া উচ্চ জাত্যভিমানের মূলে চৈতন্যদেব কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।

২. গ্রন্থকার বলিতেছেন, "Chaitanya was not primarily a thinker··· The increasing strain of an impossible emotionalism upon a highly-wrought nervous system made serious intellectual effort quite out of the question" (p. 88),

আমরা জিজ্ঞাসা করি যীশুখ্রীষ্ট কি 'thinker' অথবা 'philosopher' ছিলেন? চৈতন্যদেব অনেক গ্রন্থ, অনেক দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পূর্বে অনেক thinking and discussion (তর্কবিতর্ক) করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবানকে তর্কে পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তিতেই পাওয়া যায়। সেইজন্য তিনি সহজে তর্ক করিতে সম্মত হইতেন না।

৩. গ্রন্থকার বলেন (p 108) কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'পরকীয়াবাদী' ছিলেন, তিনি সেইজন্য চৈতন্যদেবকেও পরকীয়াবাদী করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ-ভক্তিধর্মের কদর্থ করার জন্য চৈতন্যদেব দায়ী নন। তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণকে উপাসনা করিতেন, কারণ রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পতি-পুত্র-সুহৃৎ ও সহোদর রূপ সমস্ত বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব আত্মসংযমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি স্বকীয়াবাদ অথবা পরকীয়াবাদের ধার ধারিতেন না। তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের বিকৃত অর্থ করিয়া, তাঁহার পবিত্র ভক্তিধর্মের ভিতর স্বকীয়াবাদ ও পরকীয়াবাদ প্রবেশ করাইয়া, কোন কোন বৈষ্ণব পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে, এমন কি পবিত্র গুরু-শিষ্যা সম্বন্ধ পর্যন্ত কলুষিত করিয়াছে, আমরা স্বীকার করি। Chaucer, Scott প্রভৃতি বর্ণিত খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের কদাচারের, মধ্যযুগের খৃষ্টান মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর অনাচারের এবং বর্তমান ইউরোপের ও অ্যামেরিকার খৃষ্টান জাতিদিগের উৎকট সমরলিপ্সা, স্বার্থপরতা ও অর্থগৃধ্নুতার জন্য যীশুখৃষ্টকে দায়ী করা যেমন অসমীচীন, সেইরূপ তথাকথিত (so-called) বৈষ্ণবদিগের কদাচারের জন্য চৈতন্যদেব এবং তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তিধর্মকে দায়ী করা অন্যায়। চৈতন্যদেব কাশীমিশ্রের গৃহের নিভৃতকক্ষে রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর এই দুই জনকে লইয়া রাধাভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। ইহার অর্থ এই যে মধুরভাবে ঈশ্বরোপাসনা শ্রেষ্ঠ হইলেও আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা না হইলে মানব এইরূপ ভগবদুপাসনার যোগ্য হয় না। সাধারণ মানবের পক্ষে দাস্যভাবে ঈশ্বরোপাসনাই শ্রেয়। আমরা স্বীকার করি যে সলোমনের গীতে (Song of Solomon—the

Bible ; Old Testament), বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতির রচনাতে, এমন কি চৈতন্যচরিতামৃতেও রামানন্দ-দেবদাসী প্রসঙ্গে এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করা হইয়াছে, যে তাহা সাধারণ মানবের মনে কামভাব উদ্দীপনা না করিয়া থাকিতে পারে না।

৪. গোবিন্দদাসের করচার অপ্রামাণিকতার অন্যতম কারণ, কেনেডী সাহেব বলিয়াছেন (p, 129) চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে তাঁহার জটারাখার বর্ণনা। চৈতন্যদেব চিমটাধারী সাধারণ 'সাধু' দিগের ন্যায় লোককে দেখাইবার জন্য জটা প্রস্তুত করেন নাই। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে গোদাবরীর পরে গোবিন্দই কেবল তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যদেব নিজে শরীরের কোন যত্ন করিতেন না ; সেইজন্য তাঁহার চুল লম্বা লইয়াছিল ও চুলে জটা হইয়াছিল। গোবিন্দের সাহস ছিলনা যে তাঁহাকে তিনি কোন আদেশ করেন।

৫. বাসুদেব দত্ত সমস্ত মানবের পাপ নিজের স্কন্ধে লইতে চাহিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের ন্যায় ভক্তকে কেন শাস্তি দিবেন? আরও তিনি বলিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে শাস্তি না দিয়াই পাপীদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। কেনেডী সাহেব বলেন যে ইহা হইলে নীতি (morality, moral responsibility) বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না (p, 220)।

যীশুখৃষ্ট কি মানবজাতির পাপের ভার নিজের স্কন্ধে লন নাই? Adam এবং Eve এর পাপের জন্য সমস্ত মানবজাতির পাপভোগ কোন্ নীতিসঙ্গত?

৬. 229 পৃষ্ঠায় কেনেডীসাহেব অবতারবাদের কথা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, 'In the Chaitanya sect, the incarnation idea, is not a clear and simple principle of thought'।

আমরা অবতারবাদের, এক অবতারই হউক কিম্বা বহু অবতারই হউক একেবারে পক্ষপাতী নাই। চৈতন্যদেব কখনও বলেন নাই যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। যীশু খৃষ্টকেও ঈশ্বরের অবতার কিম্বা পুত্র বলিতে আমরা রাজি নই। তিনি চৈতন্যদেবের ন্যায় আদর্শমানব।·· কেনেডী সাহেবের গ্রন্থের 231 পৃষ্ঠায় নিত্যানন্দ প্রভৃতির অবতারত্বের কথা বলা হইয়াছে। চৈতন্যদেব যখন নিজের অবতারত্ব স্বীকার করিতেন না তখন নিত্যানন্দ প্রভৃতির অবতারত্ব নিশ্চয় তিনি অবিশ্বাস করিতেন। বৈষ্ণব-দিগের বিস্তৃত অবতারবাদের সহিত খৃষ্টানদিগের বিস্তৃত saint বাদ আমরা তুলনা করিতে পারি! যীশুখৃষ্ট নিজেকে অবতার অর্থাৎ ঈশ্বরপুত্র (Son of God) অনেক স্থলেই বলিয়াছেন (St. Matthew-X 32 ; XI-27 ; St. John III-35 and 36, XIV-20, 21)।

৭. 231 পৃষ্ঠায় কেনেডী সাহেব লিখিয়াছেন—

"A third essential difference in the Christian and Vaishnava conceptions is the utter lack of historical basis in the Vaishnava doctrine. It is to be remembered that Krishna who is the Avatara of the Chaitanya's devotion is the product of pastoral folklore etc."

কেনেডী সাহেবের উচিত খৃষ্টান God-এর সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা এবং চৈতন্যদেবের সহিত যীশুখৃষ্টের তুলনা করা। কেনেডী সাহেব কি বলিতে চান যে Old Testament-এর God এবং New Testament এর God একই? ঈশ্বরত্বের ভাব (conception of God hood) কি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে না?

Old Testament-এর নিম্নলিখিত অধ্যায়ে (Leviticus—VI—6, XVI—10, 11, 21, XXV—44, 45, 46, XXVI—29, XXVII—3, 4, Deuteronomy—XXII—28, 29 etc) ঈশ্বরের নামে মোসেস কিরূপ নীতিশিক্ষাদান করিয়াছেন, পাঠকবর্গ বোধহয় অবগত আছেন। Old Testament-এর এই ঈশ্বর কি 'utterly mythical' নয়? তত্রাচ কেনেডী সাহেব বলিয়াছেন, "But the fact that Krishna is utterly mythical makes no difference to the devotee, in fact the distinction does not exist for him, since an uncritical acceptance of mythology as history still characterises much of popular Hinduism" যীশুখৃষ্ট 'ঈশ্বরের পুত্র', তাঁহার কুমারী মেরীর গর্ভে জন্ম, তাঁহার মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান, তাঁহার শয়তানের সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি কি utterly mythical নয়? চৈতন্যদেব নিজেকে কখনও ভগবান বলিয়া সাধারণতঃ পরিচয় দেন নাই। তিনি ঈশ্বরের সেবক বলিয়া সাধারণতঃ পরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা আমরা সহজেই অবগত হইতে পারি। কিন্তু যীশুখৃষ্টের জীবনের প্রকৃত ঘটনা আমাদের অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

৮, 245 পৃষ্ঠায় কেনেডী সাহেব লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের ভক্তি প্রবণতা তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে দুর্বল করিয়াছিল।

যে প্রগাঢ় আত্মহারা ভক্তির জন্য চৈতন্যদেব মধ্যে মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতেন, সেরূপ ভক্তির পরিবর্তে subtle theological disquisition and pedantry অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধীয় বৃথা জটিল তর্কবাদ। বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন নিমিত্ত কূটবুদ্ধি মানুষকে ঈশ্বর সন্নিধানে লইয়া যাইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়।

আকর: গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী।

চৈতন্যদেব

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)

·· বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন: চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্য যে সময়ে বঙ্গদেশে ধর্মসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে নানক ও ইউরোপে লুথার ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীতে কেমন একটি ধর্ম্মসংস্কারের হাওয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মোৎসাহ সাংক্রামিক। চৈতন্য নিজে ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য অন্যকে মাতাইতে সক্ষম হইতেন। তিনি যখন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে হরিনাম ব্যতীত অন্য শব্দ বিনির্গত হইত না। তিনি অসামান্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি সহকারিতা করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষে সুগম রাজমার্গ অথবা লৌহবর্ত্ম ছিল না, তথাপি চৈতন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত উৎসাহ সহকারে স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। আমি কানপুর প্রভৃতি দেশে চৈতন্য মতাবলম্বী হিন্দুস্থানী দেখিয়াছি। ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য এই উনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধর্ম্মোন্মত্ততার সাংক্রামিক গুণপ্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন, অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন এবং দুই তিনটি মুসলমানকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার বিধেয় কিনা ও কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায় নহে, সাধারণ হিন্দু সমাজ মধ্যে তাহা প্রচলিত হইতে পারে কিনা এই বিষয় বিচার জন্য বর্ত্তমান স্থান ও উপলক্ষ উপযুক্ত নহে।

চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এই সময়ে বাঙ্গালীর মনকে নূতন জীবন প্রদান করিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা নূতন উদ্যম ও স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে রূপগোস্বামী রিপুদমন বিষয়ে 'রাগময় কোষ', সনাতন গোস্বামী 'রসময় কলিকা', জীব গোস্বামী 'করচাই', বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন 'চৈতন্য মঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায়শেখর, বাসুঘোষ, নরহরি দাস, বৈষ্ণব দাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে নানাপ্রকার পদাবলি সকল রচনা করিয়াছিলেন।

আকর: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৭৮ খ্রীঃ

সাহিত্য-সংস্কৃতি

বাঙ্গলার গীতিকবিতা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডিদাসের ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়াছিল, মহাপ্রভুতে তাহা জীবন্ত, জাগ্রত জলন্ত হইয়া উঠিল। দিনমণি সূর্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডিদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ—বাঙ্গলায় জানাইয়া গেলেন, 'রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর পূর্ণরূপ আসিতেছে, উঠ উঠ জাগ'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন,—

'ন ধর্মং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে!
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি' !!

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন চাহিনা, জন চাহিনা, মনোহর কবিতা চাহিনা; এ সকলের কিছুই আমি কামনা করিনা। কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্বাদ কর।

চণ্ডিদাসের গানে যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, 'অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করিনা'।

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান করিলে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ, আমি জানি, তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, তাহার কথা বলিব। যদিও তাহাতে গীতিকবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা বলিতে চাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন;—

প্রভু কহে, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মাপণ সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে, স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর রায় কহে, দাস্যপ্রেম সর্ব সাধ্যসার॥

প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে, সখ্যপ্রেম সর্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো উত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে, বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে, কান্তাপ্রেম সর্ব সাধ্যসার'॥

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,—
'রায় কহে বুদ্ধিগতি নাহিক আমার'।

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন, "প্রভো, শুধু একটি কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটি বলিলেই আমার বলার শেষ হয়। কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্তবিনোদন হইবে কিনা, তাহাতে যে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "রামরায়, বল বল, সেই রাধাকৃষ্ণের বিলাস বিবর্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে।" তখন রায় গাইলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়া বাঁশীর স্বর শুনে, মহাপ্রভু তেমনিভাবে দুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হম্ রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥"

এখানে শ্রীমতী বলিতেছেন—না সো রমণ না হম্ রমণী। দুহু মন মনোভব পেশল জানি॥ মন এখানে প্রেমরসে ভরপুর। ভেদবুদ্ধি রসের অতলে ডুবিয়া গেছে। ইহাই কল্পকলার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস বিবর্ত, চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাবরাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহমন কর্মে ধ্যানে ধারণায়, ভাব সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মনে হয়, চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেকযুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গলার মনে লুকাইয়া ছিল, যে—'হৃদয়ে আছিল বেকত হইল এখন দেখিনু সে'। · যে ফুল শতযুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যাভাষায় আধো আলো আধো আঁধারের ভিতর হইতে ফোট ফোট হইয়াও ফোটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে। ধীরে ধীরে কতযুগ অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডিদাসে দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। ··

এমন করিয়া ভাবরাজ্যের খেলা সৃষ্টিতে সবুজ সরল রূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা, কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে! চণ্ডিদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গলার গীতিকবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন—ইহাই বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গলা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডিদাসের গৌড়ীয় যুগে যে-সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আরো সার্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে, জীবনে ও কর্মে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবতে ভগবানকে শুধু যুগল রসমূর্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্যদিয়া শুধু মধুরেই মিলায় নাই, তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্মের সঙ্গে রামানুজ ও মধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাব জন্মের পর, আমরা যে-সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই সকলে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রূপান্তরই তাহাদের আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহাব চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। একদিকে নিত্যানন্দ আব একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্যদিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্তন আছে, এখনও বাঙ্গলায় তাহা ভিখারী বৈষ্ণব গাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে কল্পকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই—শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে।

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল ফাটিয়া দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছে,—"মেরেছ কলসীর কানা/তাব'লে কি প্রেম দেব না।" এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মনপ্রাণ এক অদ্ভুত নবরসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছলছল করে, মনে হয়, আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি।[১]

আমার বাঙ্গলার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত কাহাকেও দেন নাই।..সেই বাঙ্গলা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ।..আজ এই তমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগদ্বেষ বর্জিত হইয়া আমাদের জীবনের রাধাকে বাঁচাইতে হইবে।.. হে বাঙ্গালী, বাঙ্গলার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর! দেবতা চায় অমৃত। মানুষের এই দেহমনপ্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রয়ের ভিতর অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিয়াছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার, মহতো ভীতি হইতে নিজেদের বাঁচিবার জন্য বাঙ্গলার সবুজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া পূর্বাস্য হইয়া দিনের আলোকে নিজেদের সন্ধান করিতে হইবে, তবে সেই অমৃতে আমাদেরই অধিকার। বাঙ্গলার সশক্তিক কবি চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের, বাঙ্গলার স্বধর্মপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রসসৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণের জিনিসকে তাঁহারা যেমন বুকের ভিতরে প্রাণ ভরিয়া রাখিতে

পারিয়াছেন, সেই সাধনের পথে, সেই অনুপম কাব্য সৃষ্টির পথে নিজেদের ও দেশের গতিকে লইয়া যাও, নিজের জীবনে ও কর্মে মিলাও। তোমার নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে।[২]

বাংলাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কল্পকলার ধারা, যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেননা, বাঙ্গলা দেশ সাধন-ধর্মের উপরই সকল কর্মের সকল সৃষ্টির—সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ঐ রূপের মধ্যেই চিত্রে, সুরে, কথায় নানা রূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ সৃষ্টি। এমন করিয়া রূপের পর রূপ, মূর্তি, স্রোতের মত লীলাচাঞ্চল্য বারিধি-বুকে লহরে লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলাতরঙ্গের যে দোলন-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলামৃতের মধ্যে রস-রেখায় বসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু, আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জয়নি-জয়নি' আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়া এই রস সাধন করিতেছি। সেই রসসাধন যেমন আমার ধর্ম, সেই ধর্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কল্পকলার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাংলাদেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্ম সাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত্রের ধারায় বাংলাদেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দের জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্তি ফুটিয়াছিল, নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রতি গৃহেই ভক্তের ভগবান্ অধিষ্ঠান করিলেন। প্রতি গৃহেই গোবিন্দের মন্দির উঠিল। সে অমিয় ভরা হরি ধ্বনি মুসলমান-সভ্যতার ছাঁচকে বদল করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করুন, দেখিবেন—আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কিনা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই উদ্ধার বর্ণন পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।...

এই যে বৈষ্ণবের শক্তি ও প্রেমের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই প্রেমধর্মের স্রোতে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য কল্পকলা গঠিত হইয়াছিল; তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই যে চরিত-চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? Realism না Idealism-এর কল্পকলা? আমি বলিব, এই যে অভিনব চরিত্র-সৃষ্টি, ইহা বাংলায়ই সম্ভব, কেন না, ইহা বাংলায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য। সেই সত্যের বর্ণনা বৃন্দাবনদাস অতি নিখুঁত তুলিকায় সংযমের সহিত তাহার সমস্ত ভাবটি ও চিত্রটি একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।... নিত্যানন্দের জীবনে সাধনের ধারায় যাহা রূপান্তর হইয়াছে, চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কল্পকলা রস সৃষ্টিতে

সেই রূপান্তরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই রসসাধনার ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট ফুটিয়াছে। সেই জীবনকে আদর্শ করিয়া মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া, আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে ও কেহ কেহ সেই রূপান্তরের পরিচয় ও জীবনের সাধনের ও কল্পকলার ধারায় গীতিকবিতা ও গানের সৃষ্টিতে বেশ ফুটিয়াছিল, সৃষ্টিতে বেশ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই সে পরিপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টিতে পহুঁছিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের যে মধুর রসের সাধন, তাহার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই অপূর্ব সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য মিশ্রিত যে অকিঞ্চন সমরস, তাহা আর কোন সাহিত্যে নাই। এই রসসৃষ্টি পরবর্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিরা সেই আদর্শেই নিজেবা সাধন করিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত রূপলাবণ্য, তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর, তাঁহার সেই অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভার সংযম ও হৃদয়ে সমাহৃত অনুপম প্রেম, যে বন্যা বাংলায় আনিয়াছিল, সে ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবের ধারায় বাংলার সাধনার সঙ্গে এক অতি নিগূঢ়যোগ আছে। চণ্ডিদাস ও বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভিতর দিয়া বাংলা তাহার এই রস সাধনা, এই সর্বধর্ম, সর্বজাতি, সর্বলোককে প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলা তখন মৃদঙ্গের মেঘগুরুনিস্বনে ও হরিধ্বনিতে মুখরিত ছিল। পবনে গগনে সে দিগ্‌দিগন্তে প্রেমের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া দিত। সেই মহাপ্রেমিক যখন মহাসমুদ্রের বুকে রূপের নৃত্য দেখিয়া, আপনাকে সেই সৌন্দর্য-রসসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্র করোজ্জ্বল উদ্বেলিত মহাসাগরের মহাপ্রাণের সঙ্গে যখন একাত্ম হইয়া রূপের সহিত মর্মে মর্মে মিলাইয়া নির্বিকল্প-মহামিলন লাভ করিয়াছিলেন, সেই এক চন্দ্রমাশোভিতা নিশা! শ্রীভগবানের রূপের তৃষ্ণা কেমন রূপের ধারার ভিতর দিয়া রূপে রূপে মিলিত হইয়াছিল! সে লীলা, সে খেলা, সে প্রেমের অজেয় তুলনা কোন দেশের সাহিত্যে মিলিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, এই রূপ, এই সুন্দরের হাসি, তাঁরই রূপ, তাঁরই হাসি।·

অবশ্য, একথা সত্য যে, এই বৈষ্ণব-সাধনা বাংলার নিম্নের আত্মার অধ্যাত্মসাধন হইলেও, তাহার একটা গতি আমরা ধরিতে পারি। একবার করিয়া কুটস্থ, একবার করিয়া কূর্মবৎ সঙ্কোচ, আর একবার করিয়া সম্প্রসারণ। চণ্ডিদাসের জনমের পর যে ভাব, যে প্রেমের সাধন তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল, আবার সম্প্রসারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। সেইভাব বাংলাকে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে সকল রূপের সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করিয়া আবার সংকুচিত হইয়াছিল।···শক্তি আবার কূর্মবৎ সংকোচে পরিণত হইল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ, জাতির নানারূপ হীনতার মধ্যে মুসলমানের অত্যাচার, সব মিলিয়া দেশ আবার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল; নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের মাঝেই রামপ্রসাদ আসিলেন। রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।" ইহার সঙ্গে মহাপ্রভুর,—"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" মিলাইয়া একই সুরের, একই ভাবের, একই স্রোতের টানে চলিয়াছে; বাংলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম ভক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা, বাংলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলার প্রাণধর্মের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

আকর: ১, বাঙ্গলার গীতিকবিতা প্রথম কল্প [নারায়ণ, পৌষ, ১৩২৩]
২, বাঙ্গলার গীতিকবিতা দ্বিতীয় কল্প [নারায়ণ, চৈত্র, ১৩২৩]

চৈতন্যপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

কাব্যে ও কীর্তনে

· চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তিপাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করেনা, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল— সেই ভাঙন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিভিন্ন করিয়া তোলে তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরাজিতে রোম্যান্টিক মুভমেণ্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কীর্তন গানের তেমনই অনাদর ঘটিয়াছে।[১]

··কীর্তনের আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্ম সাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।...[২]

মূর্তিপূজায়

·· কোন স্বভাবভক্ত যখন মূর্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে মূর্তিকে অমূর্ত করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার প্রত্যক্ষবর্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন তাহাকে বিদ্যুদ্‌বেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; বাহিরের উপলক্ষ তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র, তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন

হয় না ; বিশ্ব সংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার তো কথাই নাই। যে লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে, সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর যখন 'গা' এবং 'ছ' দেখে, তখন ক্ষুদ্র গ' এ আকার ছ দেখেনা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্তমধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল অসামান্য প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য। সে প্রতিভা চৈতন্যের ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল।[৩] …

আকর : ১. 'সংগীতের মুক্তি' : সবুজপত্র ১৩২৪ ভাদ্র
২. আলাপ-আলোচনা : রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়—প্রবাসী ১৩৩৪ কার্তিক।
৩. সাকার ও নিরাকার : রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সং) ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩০৫ আশ্বিন।

বন্যা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০)

আমি ভালবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,
শুরু তার কলকল্লোলে পাই অকূলের আহ্বান।
চৌদিকে ওই ছল ছল-করা গৈরিক-গলা জল;
উন্মাদনার একি উৎসব! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা, প্রেমের বন্যা-উদ্দাম আলোড়ন,
এলো ভাসন্ত, ভরা বসন্ত—দুরন্ত যৌবন।
দুকূল ভাসানো অকূল পাথার উচ্ছ্বাস বহে যায়
যেন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রতি জল কণিকায়।
এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু শ্রমণ সাথে,
কপিলাবস্তু, তক্ষশীলা ও নালন্দা সারনাথে।
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর জটাজাল
চৌদিকে রচি দুর্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবালো নদীয়া শান্তিপুর,
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন, বহে গেল দূর দূর।
ভালবাসি জল দেখিয়া আমার উল্লাসে নাচে হিয়া
জগন্নাথের রথের অগ্রে গেরুয়া কীর্তনীয়া। [স্বর্ণ সন্ধ্যা, ১৩৫৫]

দুটি গৌরগীতি

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬)

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়—তোরা দেখবি যদি আয়
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা কেউ বলে তায় শ্যামরায়॥
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে রাধা কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে ;
আবার কেউ বলে তায় গৌর হরি, কেউ অবতার বলে তায়॥
ভক্ত তারে ষড়ভুজ শ্রীনারায়ণ বলে ,
কেউ দেখেছে শ্রীবাসের ঘরে কেউ বা নীলাচলে।
দুই হাতে তার ধনুর্বাণ ঠিক যেন শ্রীরাম,
দুই হাতে তার মোহন বাঁশী—যেন রাধা শ্যাম ,
দু'হাতে তার দণ্ড ঝুলি নবীন সন্ন্যাসীর প্রায়।
সে আপনি কেঁদে হরিপ্রেমে ত্রিজগৎ কেঁদে ভাসায়॥

১

পথে কি দেখ্‌লে যেতে আমার গৌর দেবতারে।
যা'রে কোল যায় না দেওয়া, কোল দেয় সে ডেকে তারে
নবীন সন্ন্যাসী, সে রূপে তার পাগল করে
আঁখির ঝিনুকে তার অবিরল মুক্তা ঝরে।
কেঁদে সে কৃষ্ণের প্রেম ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে॥ (আমার গৌর)
জগতের জগাই-মাধাই মগ্ন যারা পাপের পাঁকে
সকলের পাপ নিয়ে সে সোনার গৌর-অঙ্গে মাখে।
উদার বক্ষে তাহার ঠাঁই দেয় সকল জাতে
দেখেছ প্রেমের ঠাকুর সচল জগন্নাথে ?
একবার বল্‌লে হরি যায় নিয়ে সে ভবপারে॥ (আমার গৌর)

গৌরলীলা

লাল মামুদ

সোনার মানুষ ন'দে এলোরে, ভক্ত সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে, ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥
(ও তাঁর) সোনার বরণ, রূপের কিরণ, দেখতে নয়ন ঝরে ॥
(গৌর) হরিনামের বন্যা আনি, ধন্য করেছে ধরণী,
বিরাম নাই আর দিন রজনী,
নামের স্রোত চলেছে ধীরে ধীরে, কলির জীবকে ভাসাইয়া নিচ্ছে প্রেমসাগরে ॥
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনার নূপুর, সোনার চরণ,
চারিদিকে সোনার কিরণ, ছুটেছে আলোকিত করে,
কত লোহার মানুষ সোনা হল গৌর অবতারে ॥
যাঁরা ভজে সোনার মানুষ, তাঁরাও হবে সোনার মানুষ,
লাল মামুদের হৈল না হুঁশ, এখন আর দোষ দিবে কারে ?
সে যে সার জীবন কাটাইল রঙ্গের বাজারে ॥

গৌরলীলা

শাহ আকবর

জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা। আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া। আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই চারি চলু নটনটিয়া। থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া ॥
ঐছন পঁহুকে যাদু বলিহারী। শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী ॥

গৌরবিরহ

রউফ

বন্ধুরে দেখিতে যাব আমি গো নদীয়া, পাইলে তারে জিজ্ঞাসিব পায়েতে ধরিয়া ॥
শুন শুন ওহে নাথ শুন মন দিয়া ছাড়িয়া আসিলে মোরে কি দোষ দেখিয়া ॥
শত দোষের দোষী আমি আছিত জানিয়া, ক্ষমা চাই তব পদে বিনয় করিয়া ॥
দয়া কর মোর প্রতি দুঃখিত জানিয়া, নহেত মরিব আমি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥
রউফ বলে বল তার পায়েতে ধরিয়া, মরণ সময়কালে দেখে যে আসিয়া ॥

গৌরাঙ্গের রূপ

আবুল হুছন

এক মুখে পারিনা গো আমি গউর রূপ বাখানি ॥
গউর রূপ বাখানি গো সখি গউর রূপ বাখানি ॥
অপরূপ গউর রূপ নির্মল বরণি ॥
ঐ রূপের তুলনা যিনি বিজুলী নিশানি গো সখি।
সুনার বরণ গউর মুখে মধুর বাণী ॥
ঐ রূপে হরিয়া নিল যুবতীর পরানি গো সখি।
আবুল হুছন বলে গউর মর্ম জানি ॥
অন্তিম কালে মনে আশা-গুরুর চরণখানি গো সখি
গউর রূপ বাখানি।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস

ছহিফা বানু

হরিনাম মুখে বলে, নিমাই আমার কোথায় গেলে.
যাবার কালে মা বলিয়ে, কেন আমায় না জাগালে।
আজ নিশি প্রভাত কালে, মা জননীর প্রাণ বাধিলে,
গুরুর কাছে কি শিখিলে, ডোর কৌপীন সার করিলে।
হাতেতে করঙ্গ লইয়ে, নাম জপতেছে ভিক্ষার ছলে.
গৌর-খেদে ছহিফায় বলে গৌরচান্দ পাব ধ্যান করিলে ।

['ছহিফা সঙ্গীত'-১৩১৪ সন]

বাউল

আবজল

গউর রে, তুমি ভাসাইলায় সাগরে
মিছা-দোষী কলঙ্কিনী বানাইছ আমারে। দয়াল গউর রে ॥
গউর রে, হাটে যাও, বাজারে যাও কিনিয়া আনবায় কি।
আমার লাগি কিনিয়া আনিয়ে৷ রউয়ের মুড়ি। দয়াল গউর রে ॥

মাও মইলা, বাপ মইলা, মইলা সোদর ভাই,
একাকিনী রইলাম আল্লা না দেখি উপায়। দয়াল গউর রে॥
আট আঙ্গুলা কোদালখানি ষোল্ল আঙ্গুলা ডাঁটি,
এবে দিয়া খুঁড়ইন বন্দায় নিজ ঘরের মাটি। দয়াল গউর রে॥

ফকির আবজলে বলে, শুনো রে কালিয়া।
নিভি দিয়া মনেরই আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া। দয়াল গউর রে॥

[শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত গুরুসদয় দত্ত]

আকর : বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি ।দমগুষা। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

দয়াল গৌর

কুবির গোঁসাই

দয়াল গৌর হে তোমা বই কেহ নাই।
আমি খেতে শুতে পথে যেতে তোমার গুণ গাই॥

সহায় ও সম্পত্তি তুমি
আমার বিভব পরমার্থ তুমি
আগম্য নিগম্য স্থান আছে তোমার ঠাই॥

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তোমার নাম আদিধাম যে পদার্থ
তুমি দয়াল সর্বতত্ত্বসার
দিও বাঞ্ছা চরণে ঠাঁই॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি যীশু তুমি কৃষ্ণ

আমার মরণকালে চরণ দিও আর কিছু না চাই॥
আমি সবধামে তোমায় হেরি
কুবির কয় চরণ ধরি আমার ঘুচাও আশাবাই॥

আকর : সাহেবধনী সম্প্রদায়- তাদের গান : সুধীর চক্রবর্তী

গৌরপ্রেম

যাদুবিন্দু গোঁসাই

আমি বুঝলাম মনে গৌর সনে পিরীত করা হয় নি।
ও সেই গৌর নামে গৌর প্রেমে আমি তো মোহিত হয়ে রইনি
সরল মনে সাধুর সনে আমি তো গৌর কথা কইনি॥
গৌরভাবে ভাবি হতে পারলাম না তো কোন মতে
ঘুরে ঘুরে বেড়াই পথে পথে—
আমার মনের মলা বিষম ঘোলা জ্ঞান-সাবানে ধুইনি।
সুখের আশা ষোল আনা ক্ষীর-নবনী মাখন খানা
খাবার তরে লোভ করে বসনা।
আমি আপ্তসুখী বলবো বা কী এক রতি দুখ সইনি॥
যাদের আছে নিষ্ঠা-রতি দূর করেছে কুল জাতি
গৌর পতি গৌর মুক্তিগতি।
তারা গৌর পাবে সাধ পুরাবে সামান্য সুখ নেয়নি॥
যাদুবিন্দু উরোনপেকে কুবির নাম বলে না মুখে
বসে বসে গুরুক তামাক ফোঁকে
গোঁসাই কুবির চাঁদের যুগলচরণ হৃদ-মাঝারে থোয় নি॥

বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীচৈতন্য

দীনেশচন্দ্র সেন

চণ্ডীদাসের গীতি এইরূপ

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইঁহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

'এরূপ হইবে কোন্ দেশে'?—প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে, তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্যপ্রভু আর রামানন্দ রায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্যপ্রভুর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষা অপূর্ব হইত। গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ—গোলাপের সুঘ্রাণ ও পদ্মের সুঘ্রাণ মিশিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব-রাগ, রাধিকার ব্যাকুল, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার—'জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর', কৃষ্ণ অঙ্গ ভ্রমে কুসুমলতা আলিঙ্গন, একদৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া যাইত; ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আত্মবিস্মৃতি আজ শুষ্কযুগে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভাস্বরূপ পূর্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন ইত্যাদি যেসব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে; প্রেমের আশ্চর্য স্ফূর্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্রঢেউ যমুনা-লহরী হইয়াছে, চটক পর্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে।

চরিতশাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে, এবং উভয়ই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে; তাহা কিরূপ, দেখাইতে চেষ্টা করিব।

চণ্ডীদাস রাধার অজ্ঞান অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

'তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে ॥
তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে' ॥

সার্বভৌমের গৃহে যখন চৈতন্যপ্রভু অজ্ঞান, তখন—

'সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হইল ॥' (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৬)

শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া—'বিজনে আলিঙ্গনই তরুণ তমাল' (পদকল্পতরু, ৩৯ শ্লোক) ও মেঘ দেখিয়া 'চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা' (চণ্ডীদাস), কৃষ্ণভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়—

'চটক পর্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে' ॥
'যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমবশে নাচে প্রভু পড়ে কাঁদি' ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৭)
'তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥' (গোবিন্দদাসের কড়চা)
'বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন'। (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য/১৭)

এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে চেতন করিবার জন্য বলা হইত—

'উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী দেখ কৃষ্ণ গুণমণি'। (দিব্যোন্মাদ)

চৈতন্যদেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা,—

'কখন বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্ছিত।
কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত' ॥ (চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড)

রাধিকা কৃষ্ণনাম শুনিলে বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন,—

'অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ভূতলে লুটায় ॥' (চণ্ডীদাস)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পদে ধরিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন,—'কৃষ্ণঅনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।

শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥
যদি কেহ রাধা বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে ॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে' ॥ (গোবিন্দদাসের কড়চা)

শ্রীরাধিকা—'পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি'। (চণ্ডীদাস)

চৈতন্যদেবও—

'গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস। কোথাহরি আছেন শ্যামল পীতবাস॥

সে আর্তি দেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুর বচন নাহি স্ফুরে॥
সম্ভ্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয়॥
হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া'॥
(চৈতন্যভাগবত/মধ্য)

কৃষ্ণপ্রেমে মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সুখী হইতেন—ভরমে তোমার নাম ক্ষিতিতলে লিখি' (চণ্ডীদাস); চৈতন্যদেবও

'ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥ [চৈতন্যভাগবত/মধ্য]

রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিভোর—'হাস, হাস নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখী।
এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি'॥

চৈতন্যদেবও রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া—

'বোল বোল বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর॥
বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে দ্বিজবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখে মনোহর।
লোচনের জল হল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবের উদিত॥ (চৈতন্যভাগবত / মধ্য)

গোরার সন্ন্যাস নবদ্বীপের ইতিহাসে বিয়োগান্ত নাট্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে—শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রন্দনরাশি পদকর্তৃগণের মাথুর-কীর্তিত যশোদা ও রাধিকার শোকোচ্ছ্বাসে জীবন্ত দুঃখাশ্রু ও মর্মবেদনার স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে।

প্রস্ফুট কদম্বপুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুল্ল পদ্মদলের ন্যায় প্রেমাশ্রু-পূর্ণ চক্ষু—ওই ছবিখানি শ্রীচৈতন্যদেবের। ইঁহার প্রেমের অনন্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়। অপরাপর কবিগণ তটস্থ দর্শকের ন্যায় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতিরচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলোকিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত। তাঁহার লীলাকাহিনী যাঁহারা জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা পাছে এণ্ড্রোমেকি, জুলিয়েট, ডাইডোর সঙ্গে বৈষ্ণব কবি অঙ্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করান, এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা খাঁটি সত্য; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণভ্রম হইয়াছে, তাহার পর 'কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি' প্রভৃতি কথার উদ্ভব

হইয়াছে। কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়, 'মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন'॥ (চৈতন্যভাগবত)। এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি যাঁহার নির্মল অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত প্রেমধারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দরভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীনা বঙ্গ ভাষা যাঁহার পবিত্র স্পর্শে গঙ্গাধারার নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম।

আকর: 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সপ্তম অধ্যায়—সূচনা

সর্বভারতীয় শ্রীচৈতন্য

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

"বৃহত্তর বঙ্গ বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রসার, মোগল-পূর্বযুগে একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের সময়ের মত সজ্ঞান গৌড়িয়াপনা বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই ছিল না। চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালীকে আর "ঘরো" ও "কুনো" থাকিতে দিলেন না, তিনি যে নাম প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন তাহাতে সে আর নিজ কুটীর বা গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল, রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড় হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শপুরুষ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গলা দেশের নহেন—তিনি বাঙ্গালীত্বের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এরূপ করিলে তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্যাদা করা হইবে। পুরীতে জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছিলাম - চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গভীর ভক্তির সহিত তিনি বলিতেছেন- "মহাপ্রভু লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ জাতির নন, তাঁহার বাল্য জীবন ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে, দক্ষিণীদের মধ্যে ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে মধ্য-জীবনের কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন, এবং তাহার শেষ জীবন তিনি যাপন করেন উড়িয়াদের মধ্যে। চৈতন্যদেবের শিক্ষায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল, বাঙ্গালী পশ্চিমে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলির উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবচিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দুযুগের পরে আবার বঙ্গের বাহিরে গৌড় বঙ্গের পণ্ডিতদের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল। [১]

ষোড়শ শতক হইতে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অবস্থানের ফলে, বৃন্দাবন বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

মুসলমান যুগে চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ছাড়া বাঙ্গালাদেশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভূত হয় নাই। ধর্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান ছিল না।[২]

"বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টি লাভ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারাসৃষ্টি বা

প্রবর্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের গুরু পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে রস-শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে সকল মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি, বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্যন্যায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রীকুল্লূক ভট্ট শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের, তাহার রসানুভূতির যে পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জনসঙ্গীত কীর্তন গানে যে লক্ষণীয় এবং অতিবিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীতের প্রাণ স্বরূপ সেই কীর্তন গানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া নূতন উদ্যমে পুরী গয়া-কাশী-বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, এবং আরও পশ্চিমে গেল,— ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব দেখি।"[৩]

আকর : জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

১ তদেব, পৃ ২২-২৩

২ তদেব, পৃ. ২৪

৩ তদেব, পৃ ৩০-৩১

শ্রীচৈতন্যদেব

গোপাল হালদার

প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহ বাঙ্গলাদেশে'--বাঙলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পরলোকগত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এ কথাটি অনেকেরই কানে অত্যুক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু কথাটি তাঁর একার নয়, কথাটি সাধারণ বাঙালী হিন্দু নরনারীর অধিকাংশের। চৈতন্যদেব তাঁদের অনেকেরই কাছে প্রেমের অবতার, আরও অনেকেরই কাছে মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। এই প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসী বাঙালীর জীবনে ও ইতিহাসে যে অপূর্ব প্রেরণা দান করে যান, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা বিচার করলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে বাঙালার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে মানতেই হবে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাঙলা সাহিত্যকে এমন সৃষ্টি প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন নি। তাই একটি পংক্তি না লিখলেও শ্রীচৈতন্য ইংরেজ পূর্বযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান পুরুষ।

মধ্যযুগে উত্তর ভারতে, পারস্যে, ইউরোপে ও অনেক দেশে এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন সাধক সম্প্রদায় ও তাঁদের ধর্মগুরুদের আবির্ভাব দেখা যায়, এটা আকস্মিক নয়। কারণ, তখন সমাজ সামন্ত যুগের কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই বন্ধনের জ্বালা তারই মধ্যে কখন কখন অতি সংবেদনশীল চিত্তে অসহ্য হয়ে উঠত। তাঁরা সেদিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ অচেতন বিদ্রোহী। তাঁদের সেই বিদ্রোহ তখনকার দিনে স্বাভাবিক ভাবেই রূপ গ্রহণ করত ধর্মগত কোন আবরণের আড়ালে—তাতে অনেক সময়ে বাস্তব রাজশক্তি ও সমাজ শক্তির কঠোর শাসন এড়িয়ে যাওয়া যেত, অনেক সময়ে শাসক শক্তির অত্যাচার সইতেও হত না। অবশ্য বিদ্রোহটা বাস্তব ক্ষেত্রেও যে একেবারে প্রভাব বিস্তার করত না তা নয়। যখন সামন্ত যুগে সমস্ত সমাজই ছিল থাক থাক করে ভেদের নীতিতে সংগঠিত তখন এই আধ্যাত্মিক সাম্য ও মরমিয়া প্রেম-ভক্তিবাদ মানুষে মানুষে ভেদরেখা টানত না। এই আধ্যাত্মিক অভেদবাদ বাস্তব জীবনেও মানুষে মানুষে ভেদের রেখাটাকে মুছে ফেলতে চাইত। তাদের অনুচররা প্রায়ই আসত জনসাধারণ থেকে। আর তার জন্যই প্রায় দেশেই এই ধর্মগুরু ও তাঁদের মণ্ডলী রাজশক্তির হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। একথা বিশেষ করে সত্য পারস্যের সুফী সাধকদের সম্বন্ধে ও ভারতের নানক-শিষ্য শিখদের সম্বন্ধে। মধ্যযুগের সাধকদের সম্বন্ধে যে কথা সত্য, তা শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও সত্য—প্রেমধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ তা হল সামন্ত যুগের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। কিন্তু সামন্তযুগের মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও নয়। তা সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না, অথচ সে ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতেও প্রস্তুত নয়। চৈতন্য

দেব মুসলমান-শাসিত হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রবক্তা হিসাবে সদাচারী, হিন্দু সমাজ ধর্মের পক্ষপাতী, জাতিভেদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রত্যক্ষত দণ্ডায়মান হননি। কিন্তু সামন্ত যুগের অনুদার মতাদর্শকে অস্বীকার করেই তিনি প্রচার করলেন—জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম ধর্ম, নাম-সংকীর্তন। এই অধিকার ভেদের দেশে কৃষ্ণ নামে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই অধিকার, এই একক সাধনার দেশে সকলের সমবেত সংকীর্তন নবদ্বীপের পথে পথে, পুরীর রথাগ্রেও সকল জাতের মানুষ নিয়ে প্রেমের পরমোৎসব—সেখানে যবন হরিদাস পর্যন্ত তাঁর পরম অনুগ্রহ ভাজন সহচর,—এসব চৈতন্যদেবের মহৎ সংস্কার-প্রয়াসেরই প্রমাণ। এ দেশে, এ সমাজে—সে যুগের তুলনায়,—নিশ্চয়ই এই সাধনাদর্শ ও সাধন-প্রয়াসকে আমরা আজকের প্রচলিত ভাষায় 'গণতান্ত্রিক' বলতে পারি—যদিও তা রাষ্ট্রশক্তির সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, সমাজ শক্তিকেও তা অস্বীকার করতে ব্যস্ত নয়। এ হিসাবে বুদ্ধদেবের সঙ্গেই চৈতন্যদেব তুলনীয় দু'জনেই সমাজের মহৎ সংস্কারক, তবে বিপ্লবী নন, বিদ্রোহীও পুরোপুরি নন।

মধ্যযুগের সাধারণ অন্যান্য সাধকগুরুর মতো শ্রীচৈতন্যদেবেরও ভূমিকা ছিল প্রধানত সংস্কারকের, ভাববাদী বিদ্রোহীর। কিন্তু বাঙালী সমাজে তাঁর নিজস্ব একটি ভূমিকা ছিল, তাও আমরা এখানে দেখতে পাই। বাঙালী শাসিত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে তিনি সার্থক রূপ দান করেন—একদিকে অভিজাতদের মধ্যে ম্লেচ্ছাচার রোধ ক'রে, অন্যদিকে জনসাধারণকে সংকীর্তন ও নাম ধর্মের সাহায্যে প্রেমধর্মে সমান অধিকার দান ক'রে। আর তৃতীয়ত এইভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গকে এক ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়-ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন,—এবং সেই সমাজের মন থেকে আগেকার অনুষ্ঠান-বাহুল্য কতকটা বিদূরিত করেন, সাধারণ ভাবে সেই মনে জাগিয়ে তোলেন সমকালের প্রতি একটা মমতা (তাই চৈতন্য-ভক্তের কথা হল 'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার'), মানুষের একটা মূল্যবোধ (তুচ্ছতম মানুষও 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে')। এই সাংস্কৃতিক সামাজিক জাগরণে বাঙালীর চেতনা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে নানা দিকে অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাঙালীর এই জাগরণ সম্পূর্ণ জাগরণ নয়, কারণ বাস্তব জীবন ও বৈষয়িক উদ্যোগ প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সীমাবদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই জাগরণ আবদ্ধ ছিল। তবু এই জাগরণ এক পরম মহোৎসব, আর সাহিত্যে মুখ্যত তা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীর দান।

চৈতন্যদেব কোন সম্প্রদায় গঠন করে যাননি, কিন্তু তাঁর জীবিত কালেই তাঁকে কেন্দ্র করে একাধিক বৈষ্ণব মতবাদ ও বৈষ্ণব-মণ্ডলী গঠিত হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রবিহিত ভক্তিবাদ বা 'বৈধী ভক্তি'র পরিবর্তে চৈতন্য ভক্তরা 'রাগানুগা ভক্তি'কেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে গ্রহণ করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের নিকট চৈতন্যই হন স্বয়ং ভগবান। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবদের নিকট যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীরা তেমনই চৈতন্যই আবার

'পরম নাগর', আর ভক্তরা 'নাগরী'। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে অদ্বৈত আচার্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে এক বৈষ্ণব শাখা; গদাধরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'গৌর পারম্যবাদ' বা গৌরাঙ্গ পূজার সম্প্রদায়; এবং নিত্যানন্দের নেতৃত্বে যারা গঠিত হল তাদের মধ্যে ষোল শত নেড়ানেড়ীরাও ছিল—যারা ছিল বিলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধ (সহজিয়া) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মানুষ। বোঝা যায়, সহজিয়া তান্ত্রিক মণ্ডলীগুলির পক্ষে চৈতন্য সম্প্রদায়ের দ্বার প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মতবাদেও সহজিয়া প্রভাব দেখা যায়, আর নিত্যানন্দের নামে তো সহজিয়ারাই বৈষ্ণবদের এক বৃহত্তম সম্প্রদায় (বৈরাগী) হয়ে ওঠেন। 'প্রকৃতি-সাধনা', 'পরকীয়াতত্ত্ব' প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের মতবাদের মধ্যে তাই সহজেই অঙ্গীকৃত হয়।

এই সব নানা শাখা লুপ্ত হয়নি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীরা। ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৈরাগ্যবাদী পরমভক্ত এই গোস্বামীরা বাঙলার এইসব শাখা থেকে দূরে ছিলেন। বৃন্দাবনে বসে রামানুজ ও মাধ্ব সম্প্রদায় প্রভৃতি অন্যান্য ভক্ত মণ্ডলীর পরিবেশে তাঁরা নিজেদের মত, তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি প্রণীত করলেন, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ, বিশেষ করে ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্রের উপরে তা প্রতিষ্ঠিত হল। সেই মতেও শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণেরই অবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের ব্রজলীলাই হল তাঁদের নিজেদের তত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য। 'রাগানুগা ভক্তিই অবশ্য এই সাধনারও প্রধান পথ, কিন্তু আচারে-নিয়মে শাস্ত্রোক্ত সদাচার, (এবং শাক্ত ও তান্ত্রিক আচারের বিরোধী) শুদ্ধাচারই গোস্বামীরা প্রতিষ্ঠা করলেন—বাঙালী বৈষ্ণব সমাজ ক্রমে প্রধানত এই গোস্বামীদেরই প্রণীত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মেই সংগঠিত হয়। অবশ্য 'রাগানুগা ভক্তি'ই তাঁদের সৃষ্টি প্রয়াসকে কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত করে তোলে—চৈতন্যদেবের নাম সমস্ত যুগের উপর অঙ্কিত করে দেয়।

শিক্ষাষ্টকের তিনটি শ্লোকের ভাষ্য

জনার্দন চক্রবর্তী

ভারতের ধর্মাচার্যদের মধ্যে সম্ভবত শ্রীচৈতন্যই একমাত্র, যিনি মৌখিক উপদেশ বা গ্রন্থরচনার পরিবর্তে নিজের আচরণ দিয়ে লোকশিক্ষা দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র আটটি শ্লোক বা 'শিক্ষাষ্টক' তিনি এ উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। 'পদ্যাবলী' সংকলনে রূপ গোস্বামী এবং অন্যত্র সেকালের ভক্ত পার্ষদেরা শ্রীচৈতন্যের রচনা হিসেবে এই শ্লোকগুলির উল্লেখ করেছেন। একালের কোন কোন পণ্ডিত এতকাল পরে এই শ্লোকগুলি প্রকৃতই চৈতন্য-রচনা কিনা, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমাদের বিবেচনায় অবশ্য এগুলি আর কারও রচনা হতে পারে না। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমভক্তিবাদের মূল তত্ত্বের সঙ্গে এই শ্লোকগুলির এক নিগূঢ় যোগ বর্তমান।

এই শ্লোকগুলির কয়েকটির ভাব বিশ্লেষণ করলেই একথা বোঝা যাবে। প্রথম শ্লোকটি হল :

"চেতোদর্পণ-মার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্ :
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্" ॥

এখানে মূল কথা হল 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্'। ঈশ্বরের নামকীর্তনে যে গভীর শান্তি এখানে তারই জয় ঘোষিত হয়েছে। এই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন শ্রীচৈতন্যের মহত্তম অবদান।

'চেতোদর্পণ-মার্জনং' —অর্থাৎ নামে চিত্তদর্পণ মার্জিত বা মালিন্যমুক্ত হয়। আমাদের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয় সত্যের ছবি। সকল ধর্মাচার পূজা অর্চনার লক্ষ্য হল চিত্তশুদ্ধি॥ নামকীর্তনের ফলশ্রুতি এই চিত্তশুদ্ধি। তার পরই হয় ভব মহাদাবাগ্নি—নির্বাপণ'। আমাদের আস্তিক্যবাদী নাস্তিক্যবাদী সব দর্শনেই 'ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, 'নির্বাণ' বা 'মোক্ষ'র কথা বলা হয়েছে। আমাদের জৈব সত্তা (ভব) দাবানল বেষ্টিত বনের সঙ্গেই তুলনীয়। ঈশ্বরের নাম জপ, অবিরল ধারা বর্ষণের মত নেমে এসে, ওই আগুন নিভিয়ে দেয়।

তারপর হয় 'শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণম্'। 'শ্রেয়স্' হল—যা পরিণামে মঙ্গলজনক ; এর বিপরীত হল প্রেয়—যা কেবল ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সুখকর। 'শ্রেয়স্' যেন জ্যোৎস্নালোকে প্রস্ফুটিত পদ্ম। ঈশ্বরের নাম ওই চন্দ্রালোক। ওই আলোতে জীবন নিঃশ্রেয়সের শতদল হয়ে ওঠে—যার চেয়ে শ্রেয়তর আর কিছু নেই। এরপর আসে 'বিদ্যাবধূজীবনের' কথা। 'বিদ্যাবধূজীবনম্'—কি চমৎকার কাব্যিক প্রকাশ! বিদ্যা এখানে এক লজ্জাশীলা বধূ যে তার স্বামীর সোহাগস্পর্শে পরিণত হয় সেবাপরায়ণা

কল্যাণী বধূতে। ঈশ্বরের নামের স্পর্শে বিদ্যার বন্ধ্যাত্ব ঘুচে যায়, বিদ্যা ভক্তিমতী হয়ে পরিপূর্ণ হয়। এরই পরিণতি 'আনন্দাম্বুধি বর্ধনম্'। 'আনন্দ' হল গভীর প্রশান্তি—উপনিষদের একটি মূল কথা। আনন্দ হল পরমতত্ব। আনন্দং ব্রহ্মেতি বিজানিয়াৎ'। একে 'রস' ('রসো বৈ সঃ') বা 'মধু' ('স মধুরূপঃ')-ও বলা যায়। মানুষ চিরকাল এর সন্ধান করে চলে। এই মধুরসের একটি কণা আমাদের সমগ্র সত্তায় এনে দেয় এক অপরিমেয় শান্তি।

তারপর মহাপ্রভু বলেছেন—'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্'। এর প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণেও যেন অমৃতের আস্বাদে অন্তর পরিপূরিত হয়। 'অমৃত'—উপনিষদের আরেকটি মূলকথা। উপনিষদের মৈত্রেয়ী ঘোষণা করেছেন, অমৃতে তাঁর জন্মগত অধিকার—'কিমহং তেন কুর্য্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্'। সুতরাং এই একটিমাত্র শ্লোকে চিত্তশুদ্ধি, নিঃশ্রেয়স্, বিদ্যা, আনন্দ ও অমৃতের প্রতি মানুষের অভীপ্সা মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য এখানে পথ দেখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরের নামের শক্তিতে মানুষের এই অভীপ্সা পূর্ণ হতে পারে। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নে প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> "রয়েছো তুমি এ-কথা কবে
> জীবন মাঝে সহজ হবে,
> আপনি কবে তোমারি নাম
> ধ্বনিবে সব কাজে।"

শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকটি হল—

> 'নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি—
> স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
> এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
> দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।'

'নাম্নামকারি বহুধা'—বহুবিচিত্র তোমার নাম, যে নামে সর্বকালে সর্বদেশে সর্বধর্মের মানুষ তোমাকে ডাকে। পরম উদার ধর্মাচার্য শ্রীচৈতন্য এখানে সকল ধর্মের ঈশ্বরীয় নামের কথাই বলেছেন। নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা'।—নাম কেবল একটা ধ্বনির শব্দ-প্রতীক নয়। নামের যে অধ্যাত্মমহিমা, তার মধ্যে অর্পিত হয়েছে ঈশ্বরের সর্বশক্তি। শ্রীচৈতন্য তাঁর ধর্মালোচনায় ও উপদেশে 'তত্ত্বমসি' না বলে মহাবাক্যরূপে প্রণব বা ওঁ-কারের ব্যবহার করতেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই কথাই বলা হয়েছে—'ওম্ ইতি ব্রহ্ম'। ঋগ্বেদের (১/২/২১) মধ্যেও পাওয়া যায়—"ওম্ অস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিন্ ভজামহে ওম্ তৎসদিতি।"—হে বিষ্ণু, তোমার নামই পূর্ণপ্রজ্ঞা। সুতরাং নামের মহিমা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেও যদি কেউ তোমার নাম জপ করে, তোমার মধ্যে ডুবে যায় সে, তুমি তাকে সুমতি বা ভক্তিদান ক'রে পুরস্কৃত কর। ঠিক এই কথাই আছে কঠোপনিষদে—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্ জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি

তস্য তৎ।"—তোমার নামের মহিমা যে জানে, তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ভগবদ্-গীতাতেও সেই একই কথা :

"পিতাহমস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঁকার ঋক্ সাম যজুরেব চ।"

শ্রুতিপ্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থান উভয়ত এই ধারণা ব্যক্ত হতে দেখা যায়। ভারতীয় মতে সমাজের সর্বস্তরে শ্রুতিকে পৌঁছে দেয় পুরাণ। পুরাণেও একথা বার বার বলা হয়েছে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তো-ভিন্নত্বান্ নামনামিনোঃ।"

'হরিভক্তিবিলাসে' উদ্ধৃত আদিপুরাণের শ্লোকে বলা হয়েছে—

"গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দনঃ॥"

মহাভারতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে মানবিক ন্যায়বিচার ও রুচিবোধ যখন পরাজিত, দ্রৌপদী তখন সাহায্য প্রার্থনা ক'রে আর্তস্বরে ডাকলেন, "গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপী জনপ্রিয়" এবং তাঁর লজ্জারক্ষা করে কৃষ্ণ বললেন—

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণামাং দূরবাসিনম্॥"

'হরিভক্তিবিলাসে' প্রভাসখণ্ডে বলা হয়েছে—

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্
সকল-নিগমবল্লরী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

এবার শিক্ষাষ্টকের শ্লোকটির 'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ' অংশটি লক্ষ্য করা যাক। ঈশ্বরের নাম কখন কীভাবে নিতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। শ্রীচৈতন্যের উদার মত এখানে ভক্তকে প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। যে-কোন সময় যে-কোন স্থানে যথেচ্ছভাবে ভগবানের নাম নেওয়া যাবে। সাধারণতঃ এই অর্থেই শ্লোকটি গৃহীত হয়। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে সম্পূর্ণ পৃথক একটি অর্থ—সেদিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শ্রীচৈতন্যের উক্তি উপলব্ধির অনন্ত ব্যাখ্যা সম্ভব, কাজেই শ্লোকের এই অংশে একটি পৃথক অর্থ খোঁজার প্রয়াস আশা করি সকলে ক্ষমার চোখে দেখবেন। এখানে 'ন একটি না-বাচক অব্যয়—একটি স্বতন্ত্র পদ। আমরা এটিকে 'স্মরণে' পদের সঙ্গে যুক্ত করে করতে চাই 'স্মরণেন' (করণ কারকের একবচন, অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া)। 'কালঃ' পদটি তখন হবে কর্মবাচ্যের 'উক্তে কর্মণি প্রথমা'। সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকটির অর্থান্তর ঘটে। তখন অর্থ দাঁড়ায়—'ভগবৎ-ধ্যানে কাল নিয়ন্ত্রিত' ঈশ্বরীয় ধারণার বিস্তারই হল কাল। কালের একটি নতুন সংজ্ঞা এখানে পাওয়া যায়। শ্লোকটির অবশিষ্টাংশে মহাপ্রভুর দৈন্য আর্তি বা দিব্য প্রকাশ পেয়েছে।

এই দীনতার আদর্শ ও ভক্তভাবে—যা কেবল কথায় নয়, শ্রীচৈতন্যের জীবনচর্যায় মূর্ত হয়েছিল—উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত শ্লোকে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥'

ভগবানের নাম করতে হবে ঠিক ঠিক ভাবে। তৃণের চেয়েও নীচু হতে হবে, তরুর চেয়েও হতে হবে সহিষ্ণু, নিজের জন্য কোন মানের স্পৃহা থাকবে না, মান দিতে হবে অপরকে।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অবধারিত ভাবে মনে পড়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে—যাঁর দীনতা গ্রথিত হয়েছে স্বর্ণাক্ষরে—

'চৈতন্য চরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞিঁ করোঁ মুঞিঁ পানে ॥

তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তিনি এর স্বচ্ছসুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

একালের মানুষেরা অনেক সময় বৈষ্ণবী বিনয়ের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই দীনতা কি আত্মমর্যাদার সঙ্গে খাপ খায়? বৈষ্ণব এর ইতিবাচক উত্তর দেবেন। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক অন্বেষায় দীনতাই হল একমাত্র যুক্তিযুক্ত সঠিক পন্থা। নিজেকে সম্মানিত করার সবচেয়ে ভাল পথ হল নিজের দোষত্রুটি ব্যর্থতা অজ্ঞতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শোনা যায়, অভিকর্ষতত্ত্বের মহান্ আবিষ্কারক স্যার আইজাক নিউটন বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "জ্ঞানের অন্তহীন বিশাল সমুদ্র আমার সামনে অনাবিষ্কৃত পড়ে রয়েছে, আমি ওই সমুদ্রের পাড়ে বসে কিছু নুড়ি কুড়োচ্ছি মাত্র।" মোহহীন আত্মবিশ্লেষণ ও নৈতিক অন্তঃসমীক্ষাই অধ্যাত্মজীবনের প্রকৃত ভিত্তি গঠন করে। দীনতা বা নম্রতা এদিক থেকে একান্ত অপরিহার্য। বৈষ্ণবীয় দীনতা তাই উপহাসের বস্তু নয়। বৈষ্ণব তাঁর নম্র ভঙ্গীতে শ্রীচৈতন্যের ভাষায় বলেন—"আমারে কিনিয়া লহ মুখে বল হরি"। বৈষ্ণবের এই বিনম্রতাই ভগবানের নাম নিতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে :—

"যাহারে হেরিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

…শ্রীচৈতন্তের শিক্ষাষ্টক চৈতন্তধর্মের সম্পদকক্ষের চাবিকাঠি। শিক্ষাষ্টকে যে জীবনাদর্শ নিহিত, তার মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল শ্রীচৈতন্যেরে আচরণে—এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐকান্তিক বিনম্রতার অস্ত্রেই তিনি বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের অন্তরের বৈরিতা জয় করেছেন। তাঁর প্রেমের ঐকান্তিকতার স্পর্শে মানুষও প্রেমিক হয়ে উঠেছিল। মানুষকে তিনি যেমন অন্তর থেকে ভালবেসেছিলেন, মানুষও তাঁকে দিয়েছিল হৃদয়-উজাড করা ভালবাসা। মানুষের ইতিহাসে মানুষের এত ভালবাসা বোধহয় আর কেউ পাননি।

আকর: Bengal Vaisnavism And Sri Chaitanya: Janardan Chakravarti (pg. 41-47)

উত্তর কথন

উনিশ-বিশ শতকের বাঙালী মনীষীদের চৈতন্য সমীক্ষার সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরও দু-একটি কথা বলবার থাকে।

প্রথম কথাটি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য সম্পর্কে। ঐতিহাসিক প্রবর উড়িষ্যার রাজনৈতিক পতনের দায় চাপিয়েছেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যদেবের উপর। তাঁর বক্তব্য, প্রতাপরুদ্র চৈতন্যভক্ত হয়ে রাজধর্মে অবহেলা করেছেন, এমন কি চৈতন্যের পরামর্শেই তিনি গৌড়জয়ের আশা পরিত্যাগ করে বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাখালদাসের এই থিয়োরীর ভিত্তি নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের ভূমিকায় উদ্ধৃত একটি পংক্তি—এটি বসু মহাশয় প্রতাপরুদ্রের প্রতি চৈতন্যের উক্তিরূপে উদ্ধৃত করেছেন—'কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য'।

এইখানেই হয়েছে 'বিস্‌মিল্লায় গলদ'। কেননা জয়ানন্দের প্রামাণিক প্রাচীন পুথিতে আছে 'কাঞ্চীদেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য'। তদুপরি মজার ব্যাপার হল এই যে, নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বিজয়খণ্ডের অন্তর্গত বলে পংক্তিটি উদ্ধৃত করলেও, তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের বিজয়খণ্ডে এই পংক্তিটি নেই।

এ সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, মুদ্রিত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজয়খণ্ডের মধ্যে এই পংক্তিগুলি পাওয়া গেল না। কুলজীশাস্ত্রের অনেক জাল পুথি দেখিয়া বসু মহাশয় যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের বেলাতেও কি তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল ?

[শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ২৪৮]

এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"এই চরণটিকে অবলম্বন করে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে না বলে হিন্দু রাজ্য কাঞ্চী আক্রমণ করতে বলেছিলেন, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেছেন, তাঁরা চৈতন্যদেবের উপর দোষারোপ করেছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেননি, তাঁরা একথা লেখার জন্য জয়ানন্দের উপর দোষারোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত প্রাচীন পুথিতে (এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398-6-c-4 নং পুথি, ১৩৬ ক পত্র) চরণটির এইপাঠ পাওয়া যায় না। তাতে আছে—

কাঞ্চী দেশ বিজয়া জিনিলেক নানারাজ্য।

সুতরাং নগেন্দ্রনাথের দেওয়া পাঠ একেবারেই ভ্রান্ত। অথচ এরই উপর নির্ভর করে চৈতন্য বা জয়ানন্দের উপর এতদিন দোষারোপ করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের পক্ষে প্রতাপরুদ্রকে 'কাঞ্চীদেশ বিজয়া জিনিলেক নানারাজ্য' বলা মোটেই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়'।...কেননা 'অন্তত ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের

রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে (*The Gajapati Kings of Orissa* by Prabhat Mukherjee, p. 81-82 দ্রষ্টব্য)।"

[বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃ. ২০৩-৫]

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ চৈতন্যের সমাজ-সংস্কার। ইতোপূর্বে দেখেছি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেছেন, চৈতন্য জাতিভেদ ও বৈধব্য বিষয়ক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন —"Such an avatar was Chaitanya, the greatest reformer that Bengal has produced · waging war against caste and denouncing enforced widow hood." বৈষ্ণবসমাজে বিধবাদের 'কণ্ঠিবদলে' বাধা নেই। কিন্তু চৈতন্যের সমকালেই বিধবা বিবাহ হয়েছিল। 'চৈতন্যভাগবত প্রণেতা 'বৃন্দাবনদাসের মা নারায়ণী সম্পর্কে চৈতন্যপার্ষদ মুরারি গুপ্তের কাব্যে বলা হয়েছে নারায়ণী যখন চৈতন্য আদেশে কৃষ্ণনামে নৃত্য ও রোদন করছে তখন সে বালিকা এবং 'অভর্তৃকা' বা বিধবা। পরে,—

"কুমার হট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস"।

[প্রেমবিলাস, ২৩ বিলাস]

এই নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং চৈতন্য নিত্যানন্দের বিশেষ স্নেহপাত্রী।

জাতিভেদের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা আছে চৈতন্যভাগবতে—'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি,—নাই'।

অদ্বৈত আচার্য যবন হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষানির্বাহ করতেন এবং কৃষ্ণকথায় কালযাপন করতেন। হরিদাস সংকোচ প্রকাশ করে বললেন—

'মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ। আমারে আদর কর, না বাসহলাজ।"

তখন, 'আচার্য্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন। এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইলা ভোজন॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্য।৩)

সংস্কারান্ধতার বিরুদ্ধে এই বলিষ্ঠতাই প্রকাশ পেয়েছে চৈতন্য জীবনে। কেবল উত্তর ভারতে নয়, দক্ষিণ ভারতেও জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করে ভক্তিবাদের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন শ্রীচৈতন্য। দক্ষিণ ভারতে তেলুগু কানাড়ী ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গীতির ভাব প্রেরণার মূলে যেমন ছিলেন মধ্বাচার্য্য ও ব্যাসরায়, তেমনই ছিলেন শ্রীচৈতন্য। ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন— These singers got their inspiration from Madhvacarya and Vyasaraya, and the visit of Chaitanya to the south in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song." (*A History of South India*' p. 393)

Charles E Gover দক্ষিণ ভারতের লোকগীতি সংকলন 'The Folk Songs of Southern India' গ্রন্থে 'বেমন' কবির রচিত একটি পদের অনুবাদ দিয়েছেন। এই বেমন সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের কবি। Gover তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন Mr. C. P. Brown, the greatest of living Telugu scholars, thinks that he (Vemana) lived in the sixteenth century.' সুতরাং বেমনের উপর চৈতন্যের প্রভাব পড়া মোটেই অসম্ভব নয়। তেলেগু ভাষায় রচিত বেমনের এই পদটির ইংরেজী অনুবাদ এখানে দেওয়া হল—

'If we look through all the carth
Men, we see, have equal birth.
Made in one great brotherhood,
Equal in the sight of God.
Food or caste or place of birth
Cannot alter human worth.
Why let caste be so supreme ?'

গ্রন্থের ভূমিকায় Gover জানিয়েছেন, এই সব গান গ্রামে গ্রামান্তরে গেয়ে বেড়াতেন 'দাস' গায়কেরা। এঁরা লৌকিক বিচারে নীচ বর্ণের হলেও উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকল বর্ণের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতেন। 'No questions of caste entered in to the matter…None dared to despise the 'Slave of God (The Folk songs of Southern India, Introduction p. XIII-XV)

E. P. Rice তাঁর A History of Kanarese Literature গ্রন্থে দাস গায়কদের উপর চৈতন্য প্রভাব স্মরণ করেছেন—'They received their inspiration from Madhvacharya, to whom they all express indebtedness, and from Chaitanya, who about 1510, visited all the chief shrines of South India· ' (p. 59)

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র তিনি দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের পতনের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তির বন্যায় ভেসে গিয়েছিল জৈনধর্মের কঠোর শাস্ত্রাচার : And finally, in the sixteenth century, a wave of Vaishnava enthusiasm, inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishna-bhakti, swept over the peninsula, and completed the alienation of the people from the austere teaching of the Jainas.'

(p. 21)

প্রেমভক্তির এই বাঁধভাঙা বন্যায় যখন দক্ষিণ ভারত প্লাবিত হল, তখন তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাদিত এক মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই; কেন না মহাপ্রভু তাঁদের দিলেন কঠোর ও অবোধ্য শাস্ত্রাচারের দাসত্বের

পরিবর্তে সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময় ধর্মজীবন; জাতিভেদ জনিত হীনমন্যতা বর্জন করে সমাজে মর্য্যাদা সম্পন্ন জীবন যাত্রার সুযোগ পেলেন তাঁরা।

মহাপ্রভুর শিষ্য সম্প্রদায়ে এই জাতিভেদ-বিরোধী অভিযান যে অব্যাহত ছিল, তার পরিচয় আছে নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবন কাহিনীতে। 'অব্রাহ্মণ' হয়েও তাঁরা 'ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দিয়েছেন। হরিদাস দাস সম্পাদিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। পৃষ্ঠাঙ্ক সহ এই তথ্যগুলি এখানে উদ্ধৃত হল :—

মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর লৌকিক জাত বিচারে ছিলেন কায়স্থ। তাঁর 'ব্রাহ্মণ' শিষ্যদের মধ্যে আছেন—গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তী (৩৮), জগন্নাথ আচার্য্য (৭৬), দুর্গাদাস বিপ্র (৯০), রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৭৪), রামকৃষ্ণ আচার্য্য (১৭৭), রূপনারায়ণ চক্রবর্তী (১৮৯), ললিত ঘোষাল (১৯৩), শঙ্কর ভট্টাচার্য্য (১৯৬), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯৮), হরিদাস শিরোমণি (২২১) ইত্যাদি।

চৈতন্য পার্ষদ হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য প্রাকৃত দৃষ্টিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। ইনি বহু মুসলমানকে শিষ্য করেছিলেন। এঁর 'ব্রাহ্মণ' শিষ্যদের মধ্যে দামোদর যোগী (৮৭), ভজন অধিকারী (১৪৪) এবং মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে সের খাঁ (বৈষ্ণব নাম শ্রীচৈতন্য দাস—২১৭) উল্লেখযোগ্য।

এই ভাবেই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যবর্গ বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন সর্ব মানবের মিলন ক্ষেত্র। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সমাজ এ আদর্শ থেকে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট হয়েছেন। অনেকে বৈষ্ণবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ পুনরায় আরোপ করছেন। কিন্তু এসব ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আজও প্রেরণা যোগায় চৈতন্য ভাগবতের বাণী—'মোর জাতি, সেবকের জাতি, নাই।'

উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালী মনীষীদের এই চৈতন্যসমীক্ষায় এবং আমাদের আলোচনায় একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ১৪৮৬ থেকে এই পাঁচশ বছর ধরে বাঙালীর গঠনমূলক কর্মে ও সৃষ্টিশীল কল্পনায় চৈতন্যপ্রভাব অতিশয় জীবন্তভাবে কাজ করে চলেছে। চৈতন্য-কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা পৌছতে পারিনি একথা সত্য হলেও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উক্তি—'বস্তুত চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই'—সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। আমাদের এই সংকলন গ্রন্থে আধুনিক কালে চৈতন্যপ্রভাবের নানাদিক দেখানো হয়েছে। বস্তুত সমাজ ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবাদর্শের চিরন্তন সংগ্রামক্ষেত্র। সমাজে মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়নি বলে মানবিকতার সপক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন তাঁদের কর্মচিন্তা বা আদর্শ স্থায়ী হয়নি একথা বলা চলে না। আমাদের মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে তা নিরন্তর ক্রিয়াশীল। চৈতন্য-প্রতিভাকে এই দিক দিয়ে অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর লোকজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বাংলার উনিশ

শতকীয় রেনেসাঁসে চৈতন্য-অবদান সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই সংকলনের অধিকাংশ মনীষী-উক্তি দ্বারা সমর্থিত।

দ্বিতীয়তঃ, ওড়িস্যার পতনে চৈতন্য আন্দোলনের দায়িত্ব, বিজয়নগর ওড়িষাযুদ্ধে চৈতন্যের ভূমিকা, শ্রীচৈতন্যের সমাজসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালী মনীষীরা পরস্পর বিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন। সতর্ক পাঠক এই সব বিরোধী বক্তব্য থেকে আসল সত্যকে ঠিকই নিষ্কাশিত করতে পারবেন।

তৃতীয়তঃ বাঙালী মনীষীদের এই চৈতন্য সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাঙালীর তার্কিকতায় পাণ্ডিত্যে হৃদয়বত্তায়, তার নৃত্যপারদর্শিতায়, অভিনয়প্রিয়তায়, সাহিত্যপ্রীতিতে, সংগীতানুরাগে, তার ভাববিহ্বলতায়, সাংগঠনিক প্রয়াসে, আত্মলীন সাধনায়, সমন্বয় মুখিতায় এবং তার সমাজ সচেতন মানবিকতায়, চৈতন্যপ্রেরণা আজও জীবন্ত; বাঙালী তাঁরই উত্তরাধিকারে ধনী। এ কোন বহিরঙ্গ প্রভাব নয়, ফলবান তরুর মত 'অবিরত-প্রেম-রতন-ফল-বিতরণে অখিল-মনোরথ-পূর' তাঁর প্রতিভা বাঙালীর জাতিসত্তাকে গড়ে তুলে তাকে ঋদ্ধিমান করেছে। সুগাতিশয়ী এই প্রেরণা ঐতিহ্যের ধারাপথে এসে আলোর মত, বাতাসের মত, আমাদের প্রাণ ও চৈতন্যের ধারায় অতি সহজে মিশে গেছে। একই সঙ্গে তিনি বাঙালীর বৈদগ্ধ্যকে এবং বাংলার লোকায়ত বোধকে উদ্রিক্ত করেছেন।

বিদগ্ধ বৈষ্ণবপদকর্তাদের রচনাকে বহুলাংশে ছাপিয়ে উঠেছে নামী-অজ্ঞাতনামা পল্লীকবিদের রচিত অজস্র লোকগীতি। চৈতন্যবন্দনায় অদ্বৈত আচার্য্যের 'শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণাসাগর। দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥' এবং নিত্যানন্দের 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণরে॥'—এই ধারা অনুসরণ করে রচিত হয়েছে অজস্র গৌরলীলাত্মক পদ। কয়েকটি গানের উল্লেখ আছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে—যেমন, গৌর এ পরম দয়াল। ধন্য ক্ষিতি ধন্য অবতার ধন্য কলিকাল॥ ২. গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসী বেশধারী। অখিল ভুবন অধিকারী॥ ৩. মোর বঁধুয়া। গৌরগুণ নিধিয়া॥ ৪. নিধিগৌরাঙ্গ—কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু। অনাথের নাথ প্রভু পতিত জনের বন্ধু॥ এবং একটি ভাটিয়ারী রাগের গান— ৫. না যাইয় না যাইয় বাপ! আমাদের ছাড়িয়া। পাপ জীউ আছে, তোর শ্রীমুখ দেখিয়া। গৌরাঙ্গ হে॥

সমগ্র বাংলাদেশের হৃদয় হতেই এ সব লোকগীতির উদ্ভব হয়েছিল—তার মধ্যে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে এই গীতরচনার ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত অব্যাহত। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, রত্নগর্ভ আচার্য্য, যদুনাথ কবিচন্দ্র এঁরা ছিলেন শ্রীহট্টের লোক। মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস করলেও তাঁর বংশের অন্যান্যরা শ্রীহট্টেই থেকে যান। চৈতন্য-পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত—এঁরা ছিলেন চট্টগ্রামের লোক। শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ., তত্ত্বরত্নাকর মহাশয় সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা' গ্রন্থে জ্ঞাতপরিচয় ৮৯

জন কবির মধ্যে ৫৮ জনই শ্রীহট্টের, ১৪ জন চট্টগ্রামের। অন্যান্য কবিরা কলকাতা, কাছাড়, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নদীয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর ও উড়িষ্যার।

এই সংকলনের ৯৪৩টি গানের মধ্যে ৭৮টি গৌরাঙ্গ বিষয়ক। অন্যান্য পদগুলি রাধাকৃষ্ণ, বাউলের 'মনের মানুষ' অথবা জাতবিচারের অসারতা ও ধর্ম সমন্বয়ের ভাব নিয়ে রচিত—অর্থাৎ সমগ্র সঙ্কলনের ভাবাদর্শ চৈতন্যপ্রভাব জাত। অতি সম্প্রতি বঙ্গভঙ্গের ফলে এবং রাজনৈতিক দলগুলির সাম্প্রদায়িক মদতে, মুসলমান বাউলদের উপর নানা অত্যাচার উৎপীড়ন সুরু হয়েছে এবং বাংলার এই ঐতিহ্যের ধারা অবলুপ্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সব লোকগীতি বাংলার গ্রাম-শহরের আখরায়-গৃহস্থবাড়ীতে-পথেপ্রান্তরে গীত হয়ে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাঙালী চিত্তকে আশৈশব প্রভাবিত করে এসেছে। লোকশিল্পের নানা মাধ্যমে এই প্রভাব হয়েছে স্বপ্রস্থ। দারুশিল্প, মৃৎশিল্প এবং চিত্রশিল্পে চৈতন্যজীবনলীলাকে ধরে রেখেছেন শিল্পীরা।

শ্রীগৌরাঙ্গের দারুমূর্তি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভবত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং প্রায় সমকালে গৌর নিতাইয়ের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন অম্বিকা কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত (মুরারি কাব্য—৪/১৪/৮—১৪)। চৈতন্যপার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, গদাধর দাস কাটোয়ায় এবং কাশীশ্বর পণ্ডিত বৃন্দাবনে গৌরাঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অনেক বছর পরে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেন (ভক্তিরত্নাকর)।

চিত্রশিল্পে চৈতন্যলীলার রূপায়ণ প্রসঙ্গে মহীতোষ বিশ্বাস লিখেছেন—"সুদীর্ঘকালের মধ্যে প্রাচীন এবং আধুনিক শিল্পকলায় শিল্পীগণ শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। বাংলার পটুয়াদের পটচিত্র এক সময় চিত্রকলাক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিল। বহু জেলায় এইসব শিল্পীগণ তাঁদের নিজস্ব ধারায় বহু বিষয়বস্তু চিত্রে রূপ দিয়েছেন। এইসব শিল্পীদের মধ্যে বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া বাঁকুড়া জেলার শিল্পীগণ দেবদেবীর চিত্র রচনা বেশী করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই পটুয়া শিল্পীরা চৈতন্যদেবের বহু চিত্র এঁকেছেন। সেইসব প্রাচীন চিত্রের নিদর্শন আজও বহু দেখা যায়। এখানে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, 'পটুয়া' জাতি ছাড়াও সে সময় পাল, দাস, মিস্ত্রী পদবীধারী যে সব হিন্দু চিত্রশিল্পী ছিলেন তাঁরাই এই গৌরাঙ্গের রূপকে চিত্রকলায় প্রকাশ করেছেন বেশি। শুধু ঘরে বসে তাঁরা চিত্র রচনা করতেন না। ধনীর প্রতিষ্ঠিত রথে, মন্দিরের দেওয়ালে তাঁরা বহু চিত্র আঁকতেন। কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রমুখ নানা দেবদেবীর মধ্যে গৌর নিতাইয়ের চিত্র রচনা করতেন। বিশেষ করে যেসব রাজা, মহারাজা, বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাহিনীর রূপকে প্রকাশ করতে শিল্পীদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এরপর ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজের প্রভাবে পাশ্চাত্য শিল্পধারায় চলন এবং চিত্রকলার বিষয়বস্তুরও বহু পরিবর্তন। তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছু শিল্পী তাঁদের চিত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনালেখ্য প্রকাশ করেছেন।"

"বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সমাজজীবনে চিন্তাধারায় যেমন কিছু পরিবর্তন হয়েছিল তেমনি চিত্রকলা ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্য ভারতীয় শিল্পধারায় কিছু শিল্পী চিত্র রচনা করলেন। তাঁদের চিন্তাধারা এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরাণিক সামাজিক বিষয়বস্তু যেমন ছিল, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন আলেখ্যও ছিল।

[শিল্পীর শিল্পে শ্রীচৈতন্য : দেশ ২০ জুলাই ১৯৮৫]

এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কমল সরকার লিখেছেন—"লিথোর মাধ্যমে পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের জন্য প্রবাদে পরিণত হয়েছিল 'ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও'। আর্ট ষ্টুডিওর প্রকাশিত অসংখ্য বড় বড় লিথো চিত্রের মধ্যে ছিল চৈতন্যদেবের নানা মনোজ্ঞ রূপারোপ। সে-যুগে বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল 'ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও'র লিথোচিত্র।... কয়েকজন শিল্পীর যুগ্ম অবদানে রচিত হয় এই লিথোচিত্রগুলি। এ-কারণে এঁদের চিত্রে শিল্পীর কোনো স্বাক্ষর নেই।...

আর্ট ষ্টুডিও প্রকাশিত চৈতন্যচিত্রের অন্যতম নিদর্শন 'গৌরসন্ন্যাস'। এই ষ্টুডিওর 'হিন্দু সেক্রেড পিকচার্স' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত এ চিত্রে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী অধ্যায়ের ভাবোন্মত্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। মহাপ্রভু ভাবাবেশে আপ্লুত হয়ে কৃষ্ণধ্যান করছেন। তাঁর মুখমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। গত শতকের আশির দশকে প্রচারিত হয়েছিল চিত্রটি।

উনিশ শতকের কলকাতার অপর চিত্রশালা 'সি অ্যাণ্ড সি পিকচার্স ষ্টুডিও'। ঐ চিত্রশালা থেকেও প্রকাশিত হয় গৌরাঙ্গদেবের লিথোচিত্র।...

"চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এঁকেছিলেন নানাচিত্র। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালায় গগনেন্দ্রনাথের একুশটি চৈতন্যচিত্র সংগৃহীত আছে। · চৈতন্যদেবের আবির্ভাব থেকে বাল্যলীলা, অধ্যাপনা, বিবাহ, ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্যলাভ, বৈরাগ্য, সংকীর্তন ও কেশবভারতীর কাছে দীক্ষা এবং প্রব্রজ্যা ও নীলাচল পরিভ্রমণের রূপ তিনি চিত্রায়িত করেন॥ চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শের প্রতি আনুগত্য রেখে গগনেন্দ্রনাথ চৈতন্য চিত্রমালায় গৈরিক রঙের ব্যবহার করেছেন।... 'পূর্ণচন্দ্র অথবা চৈতন্যের নির্বাণ' নামেও এক চিত্র আছে গগনেন্দ্রনাথের। হালকা সবুজের সমারোহে আঁকা এ পটে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে মুদ্রিত নয়নে শায়িত চৈতন্যদেবের মুখমণ্ডলই শুধু দৃশ্যমান। · জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্রের রূপারোপ ও মহাপ্রভুর মুখমণ্ডলে গগনেন্দ্রনাথের মুনসীয়ানার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।"...

"গগনেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অথবা উত্তরকালে চৈতন্যের ত্যাগ তিতিক্ষা ও প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হন অনেকেই।... 'চিত্রে শ্রীচৈতন্য' নামে নরেন সরকারের এক চিত্র সংকলনও প্রকাশিত হয় (১৩৩২)। এ বিষয়ে অবনীন্দ্র শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল, অসিতকুমার এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের শিল্পকর্ম স্মরণীয়।... নন্দলালের 'জগাই মাধাই', 'চৈতন্যের জন্ম' (ফ্রেস্কো : জয়পুরী),

'চৈতন্যের পুথি রচনা', 'চৈতন্যের গৃহত্যাগ' ও 'গরুড় স্তম্ভের পাদমূলে শ্রীচৈতন্য' শিল্পকলার সম্পদ।"

"নন্দলাল-সতীর্থ ক্ষিতীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও কৃতিত্বের মূলে কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার নানা রূপারোপ।...'চৈতন্যের গৃহত্যাগ', 'সংকীর্তন', 'যবন হরিদাসের তিরোভাব,' নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ,' 'চৈতন্য ও ময়ুর,' 'চৈতন্যের নৃত্য' 'চৈতন্যের ক্ষমা' প্রভৃতি চিত্রগুলি অন্তরের অমিয় মন্থন করেই এঁকেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

প্রদ্যোৎকুমার চট্টোপাধ্যায় আর বর্ধমানের সুরেশচন্দ্র ঘোষও আঁকেন চৈতন্যের নানা চিত্র।...যামিনী রায়, সুরেন্দ্রনাথ দাস ও কালীপদ ঘোষালেও চৈতন্যের চিত্রাঙ্কনের জন্য সুপরিচিত।

চৈতন্যের অন্যতম রূপকার পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। 'মহাপ্রভু ও শচীমাতা', মহাপ্রভু, 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'শ্রীরূপ ও সনাতন'—একদা তাঁরও চৈতন্যের চিত্ররূপ পৌছে যায় ঘরে ঘরে।" [বাংলার চিত্রে চৈতন্য' : দেশ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫]

"প্রমোদকুমারের 'রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য' একখানি উচ্চশ্রেণীর রচনা।...ক্ষিতিন্দ্রনাথের ছাত্র চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় কয়েকখানি ছবি এঁকেছিলেন। তার মধ্যে একখানি ছবি 'শচীমাতা ও নিমাই'। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে শচীমাতা নিমাইকে দেখতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে যেন আত্মহারা।" [মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ] বাংলার মন্দির স্থাপত্যে চৈতন্যপ্রভাব সম্বন্ধে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "খ্রীষ্টীয় বারো শতক নাগাদ জৈনধর্মের লোপ ও ষোল-সতের শতক নাগাদ শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার মাঝখানের চার পাঁচ শতাব্দীকাল হিন্দুরা যে প্রধানতঃ শিব, বিষ্ণু (বাসুদেব) ও শক্তির আরাধনাই করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। স্বভাবতঃই সে সময়ে এ সব দেবদেবীর বহু নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও পূর্বতন জৈনকেন্দ্রের অনেকগুলিই তাঁদের উপাসনাস্থলে পরিণত হয় ও এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। তারপরে, চৈতন্য-পরবর্তীকালে, বাসুদেব ভক্তির প্রাচীনতর ধারাটি ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণের লীলামূর্তির উপাসনায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। যে ঘটনা এই ধর্মীয় দিক্ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে তা হল ষোড়শ শতকের শেষ দিকে প্রবল প্রতাপ মল্লরাজা বীর হম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা ও এ ধর্মে তাঁর বংশধরদের স্থায়ী ও অচলা ভক্তি। প্রধানতঃ তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময়ে নতুনতর আঙ্গিকে বহু মন্দির নির্মিত হয় মল্লভূমের সর্বত্র। সেগুলির অধিকাংশই এখনও বর্তমান।...

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব দূর স্বর্গলোকবাসী এক মহামহিমান্বিত দেবতা জ্ঞানেই কল্পিত ও পূজিত হয়ে এসেছেন। চৈতন্যদেব এই দূরস্থিত দেবতাকে সুরলোকের নির্বাসন থেকে উদ্ধার করে, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার নিগড় থেকে মুক্ত করে, বাঙালীর ঠাকুর ঘরে, তার স্নেহপ্রীতি বাৎসল্যময় অন্তরের একেবারে মাঝখানটিতে বসিয়ে দিলেন। গদাচক্র প্রভৃতি ভীষণ আয়ুধ খসে পড়ে তাঁর হাতে দেখা দিল মোহন বাঁশরী। এতদিন তিনি একক পুজিত হয়েছেন ; এখন তাঁর হ্লাদিনী

শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশরূপে রাধিকা এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। যাঁর নাম এতদিন ছিল বাসুদেব, নারায়ণ জনার্দন, তাঁরই নাম হল কালোসোনা, ননীচোরা, শ্যামরায়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির প্লাবন যখন শান্তিপুরকে ডুবিয়ে ন'দে তথা বাংলাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তখন সমকালীন অন্য লোকপ্রিয় দেবদেবীরাও তাঁদের মন্দির-কারাগার ত্যাগ করে বাঙালীর অন্দর মহলের অন্তরঙ্গতায় এসে প্রবেশ করলেন। মুণ্ডমালা শোভিতা, লোলজিহ্বা, ভীষণদর্শনা কালী পরিণত হলেন সাধকের মা অথবা মেয়েতে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিকর্তা শিব জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গেলেন এক আত্মভোলা, বাউণ্ডুলে খ্যাপার বেশে। আর দুর্গা? বৎসরান্তে মাত্র তিন দিনের জন্য সে দুলালীর পিতৃগৃহে আসবার আশায় বাঙালী দিন গুণতে আরম্ভ করল। এত যাঁরা কাছের, এত যাঁরা আপন, তাঁদের পাষাণে রচিত মজবুত কয়েদখানায় বন্দী করে রাখতে বাঙালীর প্রাণ চায়নি। তার মন্দিরাদি সেজন্য তার নিজ বাসগৃহের অনাড়ম্বর ও লঘু আকৃতির সাদৃশ্যেই গড়ে উঠেছে।…ঈশ্বরকে কাছের মানুষ ভেবে বাঙালীর মনীষা 'চালা-স্থাপত্য' শৈলীর সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশের বহু অধুনাতন ইটের মন্দিরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির অলংকরণ—চৈতন্য পরবর্তী যুগে 'টেরাকোটা' মূর্তির ইলাহী ব্যবহার হয়েছে অগণিত বাংলা মন্দিরে।…গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের অন্যত্র কিছু কিছু মন্দির-টেরাকোটার সন্ধান পাওয়া গেলেও মধ্যযুগের শেষ দিকে এ শিল্পের চর্চা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশে।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের ইহলীলা সংবরণের ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেই শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মল্লরাজ বীর হম্বীর চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। তারপরে বাঁকুড়া জেলায় যত দেবালয় নির্মিত হয়েছে তার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের। নব-পর্যায়ে এই বিষ্ণু উপাসনার স্রোতে যখন মল্লভূম ভেসে গেল তখন প্রেমভক্তিধর্মের নতুন উন্মাদনায় 'টেরাকোটা' শিল্পীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। অব্যবহিত পূর্বের মোসলেম পদ্ধতিতে রচিত ফুললতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশায় হাত পাকাতে না পাকাতেই কৃষ্ণলীলার সীমাহীন চিত্রকল্পের ভাণ্ডার খুলে গেল তাঁদের সামনে।… কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অলংকরণগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কংসবধ, পুতনাবধ, কালীয়-দমন, ননীচুরী, গোষ্ঠলীলা, বকাসুর প্রভৃতি অশুভ শক্তির নিধন, গোপীদের সঙ্গে জলকেলি, নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, দানলীলা, মানভঞ্জন, রাইরাজা, মাথুর ইত্যাদি ভাস্কর্যেরই বেশী ব্যবহার দেখা যায়।…

রাধাকৃষ্ণের মন্দিরগুলিতে একাধারে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব—সব রকম ভক্তিভাবই স্থান পেয়েছে। প্রবেশ তোরণের খিলানের বক্ররেখা বরাবর শিবলিঙ্গযুক্ত ছোট ছোট প্রতীক শিবমন্দির উৎকীর্ণ করা একদা প্রথায় পরিণত হয়েছিল মনে হয়। শুধু শিব মন্দিরেই নয়। বৈষ্ণব বা শাক্ত মন্দিরেও এই সজ্জা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কৃষ্ণ বা শিবের মন্দিরে দশমহাবিদ্যা, মহিষমর্দিনী বা কালীর মূর্তি ব্যবহারে কোন বাধা হয়নি। বাংলাদেশে রামসীতার আরাধনা বিশেষ জনপ্রিয় না হলেও

সভাসীন রামসীতার পোড়া মাটির মূর্তি বহু অলংকৃত মন্দিরে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিবিধ ধর্মমতের প্রতীক এই 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলি শুধু কারিগরির দিক দিয়েই অপূর্ব নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতারও তারা বিশিষ্ট নিদর্শন।"

[বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি : ভূমিকা]

এই প্রসঙ্গে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন · "এ সব দৃষ্টান্তে আরও প্রমাণিত হয় যে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ পূজার প্লাবনে প্রাচীনতর শৈব ও শাক্ত উপাসনার ধারাগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়নি"। [তদেব]

বিলুপ্ত হবার কথাও নয়। কেননা চৈতন্যচরিতে আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সকল রকমের দেবদেবীর সামনেই নতিস্তুতি করেছেন। জয়ানন্দের কাব্যে বলা হয়েছে—'আগ্যাশক্তি বিরজা ব্রহ্মার করিল পূজা' [উৎকল-২]। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'—'আগ্যাশক্তিবেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ' [মধ্যখণ্ড/১৮ অধ্যায়] মুরারি কাব্যে মুরারি গুপ্তের মুখে 'জগৎত্রয়গুরু রামের বন্দনা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে চৈতন্য তাঁকে বলছেন "ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎ প্রসাদাৎ" [২/৭/১৮]; এবং নিজেই তিনি শিব লিঙ্গের সামনে 'নমো নমস্তে ত্রিদশেশ্বরায় বলে শিবের স্তবপাঠ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' অদ্বৈত আচার্য্যকে অর্চনা করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিও এখানে স্মরণীয়। মন্ত্রটি হল · যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে'। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল—

'রাধে কৃষ্ণো রামে বিষ্ণো সীতে বাম শিবে শিবা।
যোহসি সোহসি নমোনিত্যং যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে' ॥

শ্রীচৈতন্যের এই সমন্বয়ী আদর্শই 'টেরাকোটা' শিল্পের অলংকরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্গ সংস্কৃতিতে কীর্তনের একটি বিশেষ মর্য্যাদার আসন আছে। এ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে কীর্তন ও মৃদঙ্গ (খোল) প্রসঙ্গে চৈতন্য প্রতিভার মূল্যায়ন স্বরূপ হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

"বৈষ্ণব সঙ্গীত ও সংকীর্তন এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহা কতটা শ্রীচৈতন্যের কার্য্য, এবং কতটা নরোত্তম দাস প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণব গায়কগণের কার্য্য তাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে শ্রীচৈতন্যদেব যে অনেক পরিমাণে বৈষ্ণব সংকীর্তনের বর্তমান আকার দিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপে এবং পুরীতে যে সংকীর্তন বর্ণনা আছে, তাহা বর্তমান সময়ের বৈষ্ণব সংকীর্তনের অনুরূপ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া সম্প্রদায় গঠন করিয়া সংকীর্তন করিতেন। এক একটি সম্প্রদায়ে দুইখানি খোল, চারিখানি বা ততোধিক করতাল এবং কয়েকজন গায়ক থাকিতেন। বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবদের সংকীর্তনও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। বোধ হয় চৈতন্যদেবই স্বীয় প্রতিভাবলে এই অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর সংকীর্তন সৃষ্টি করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে সংকীর্তন প্রচলিত থাকিলেও তিনিই যে ধর্মসাধনে সংকীর্তন

বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সংকীর্তনের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নেই। যে কারণেই হউক বৈষ্ণবাচার্য্য ও ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সংকীর্তনের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ হইতেই সংকীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংকীর্তনের সাহায্যে তিনি পূর্বভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভক্তিধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম প্রচলিত থাকিলেও বদ্ধ বারিধারার মত তাহা অল্পসংখ্যক বা বিচ্ছিন্ন ভক্তমণ্ডলীতে আবদ্ধ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব আপনার হৃদয়ের অগাধ প্রেম ও ভক্তির বন্যাতে দেশ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। প্রচলিত ধর্মহীনতা, বিকৃত ধর্ম, দুর্নীতি, পাপ ও বিষয়াসক্তি দূর করিয়া সুবিমল ভক্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল।

চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবনদাস মনে করিতেন যে সংকীর্তন প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার হইয়াছিল। চৈতন্য ভাগবতের আরম্ভে যে সংস্কৃত শ্লোকে ভূমিকা করা হইয়াছে তাহাতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে 'সংকীর্তনৈকপিতরৌ' বলা হইয়াছে। শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস পুনরপি বলিয়াছেন :—

"কলিযুগে সর্ব ধর্ম নাম সংকীর্তন। সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্যনারায়ণ॥
কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে। অবতীর্ণ হইল প্রভু সর্বপরিকরে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

'হাটপত্তন' নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে :—

ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্বযুগ সার।
নাম সংকীর্তন যাহে করিলেন প্রচার॥

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক নামক গ্রন্থে সংকীর্তন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ইহা ভগবান চৈতন্যের সৃষ্টি : —"ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যসৃষ্টিঃ।"

সংকীর্তন প্রচলন যে শ্রীচৈতন্যের একটি প্রধান কীর্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। …এখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও আসাম সংকীর্তনের সুরে নাচিয়া উঠে। বাস্তবিক মানবহৃদয়কে মাতাইতে সংকীর্তনের মত সহজ ও সুন্দর উপায় আর কিছু নাই। এমন কি এখন খৃষ্টান প্রচারকগণও আপনাদের ধর্মপ্রচারের জন্য সংকীর্তনের সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই, শ্রীচৈতন্যদেব কি সংকীর্তন নূতন প্রবর্তন করেন? জনসাধারণের মধ্যে সংকীর্তনের বহুল প্রচার চৈতন্যদেবের প্রভাবেই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিই যে সংকীর্তন-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বেও বঙ্গদেশে সংকীর্তন প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় :—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস॥

সর্বকাল চারিভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥"
[চৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়]

অন্যত্র—কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্তন॥ [তদেব]

আরো—"দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্তন॥
কিছু নাহি জানে লোকে ধনপুত্ররসে।
সকল পাষণ্ড দেখি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈস্বরে॥" [তদেব]

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্বেও সংকীর্তন ছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, সেই সংকীর্তন অতি সামান্য প্রকারের ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার অনুবর্তীগণ সংকীর্তনের বহুল উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে সংকীর্তন প্রচলিত হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ের বৈষ্ণবদিগের সংকীর্তনের প্রধান অঙ্গ খোলের বাদ্য। বৈষ্ণব প্রভাবের বাহিরে খোলের বাদ্য দেখা যায় না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবই এই খোলের আবিষ্কার করেন। কিন্তু একথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে যখন সংকীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাহার সঙ্গে খোলের বাজনা ছিল। ইহার পূর্বে খোলের বাজনার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার পূর্বেও মৃদঙ্গ নামক এক প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ আছে। চৈতন্যের জন্মের সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যে সব বাদ্য বাজিয়াছিল তাহার মধ্যে মৃদঙ্গও ছিল।

ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার। মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজায় আবার॥"
[তদেব]

চৈতন্যের বিবাহোৎসবেও বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে মৃদঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ সানাঞি জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল॥" [চৈ. ভা. আদিখণ্ড, ১০ম অধ্যায়]

তবে এই মৃদঙ্গ বর্তমান সময়ের খোল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। বর্তমান সময়ে 'মৃদঙ্গ' বলিতে খোলকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বা তৎপূর্বে

বিবাহাদিতে মৃদঙ্গ নামক যে যন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বর্তমান সময়ের খোল কিনা বুঝিতে পারা যায় না। বর্তমান সময়ে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে খোলের ব্যবহার দেখা যায় না।···

···পুর্বে বৈষ্ণবেরা যে সংকীর্তন, করিতেন বোধ হয় তাহাতে খোল ব্যবহার হইত না; কেবল হাততালি দিয়া গান করিতেন। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশের পুর্বে শ্রীবাসাদির যে সংকীর্তনের বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল হাততালির কথাই উল্লিখিত আছে। যথা,

'হাতে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ। আপনা আপনি মেলি করেন কীর্তন॥

[চৈ ভা. আদিখণ্ড, ১১ অধ্যায়]

অন্যত্র—'আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥'

[তত্রৈব]

শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রথম সংকীর্তন আরম্ভ করেন, তখন তিনিও কেবল হাততালি দিয়া কীর্তন করিতেন। পাঠ বন্ধ করিয়া ছাত্রগণকে লইয়া তিনি যখন প্রথম সংকীর্তন করেন, তখন কেবলমাত্র হাততালির উল্লেখ আছে। যথা:—

'দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া। আপনি কীর্তন করে শিষ্যগণে লইয়া॥'

[চৈ. ভা. মধ্যখণ্ড. ১ অধ্যায়]

পরে কোন সময়ে মৃদঙ্গের ব্যবহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গীত বিষয়ে আশ্চর্য প্রতিভা ছিল। বৈষ্ণব-জীবনচরিত লেখকগণ তাহার কোন উল্লেখ করে নাই। তবে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবকে সংকীর্তনের স্রষ্টিকর্তা বলিয়াছেন।"

[গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব: পৃ. ২৫-৩২]

কীর্তনের ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর অবদান সম্পর্কে ওড়িয়া ও সংস্কৃত চরিতগ্রন্থের সাক্ষ্য যথেষ্ট মূল্যবান।

কবিকর্ণপুরের নাটকে ওড়িষারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রকে বাসুদেব সার্বভৌম বলেছেন নবতর কীর্তন রীতির প্রবর্তক চৈতন্যদেব স্বয়ং।—

"রাজা (নিরূপ্য)—ঈদৃশং কীর্তন কৌশলং কাপি ন দৃষ্টম্।—এরকম কীর্তনকৌশল ত কোথাও দেখিনি।

সার্বভৌম—ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্য স্রষ্টিঃ।—এটি ভগবান শ্রীচৈতন্যের সৃষ্টি।

[চৈতন্য চন্দ্রোদয়, অষ্টম অঙ্ক]

কীর্তনে শব্দভেঙে এক অর্থ, শব্দ জুড়ে আরেক অর্থ প্রকাশের যে কারুকর্ম [যেমন 'নৌকাবিলাসের' পদে—'আমি মাঝি নয়া না। নয়ানা (ন'আনা) তে হবে না'। অথবা হিন্দি ভজনে—'ম্যায় নেহি মাখন খায়োঁ। মায়নে হি মাখন খায়োঁ'] কীর্তনকে উপভোগ্য করে তোলে (পুরতো বিভক্তশব্দার্থ এব সমভূচ্ছ্রবণ প্রমোদী। শব্দগ্রহেণ তদনন্তরমন্যরূপো), এখানে তারই কথা বলা হয়েছে। কীর্তনের এই অলঙ্করণরীতির প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য—এই মূল্যবান তথ্যটি পাওয়া গেল 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে।

ওড়িয়া 'চৈতন্য ভাগবতে' ঈশ্বর দাস বলেছেন, খোলের আবিষ্কর্তা শ্রীচৈতন্য। গঙ্গানদী থেকে গঙ্গামাটি এনে কম্বুপাণি (বিষ্ণু) শচীদুলাল স্বয়ং খোল তৈরী করলেন।—

'গঙ্গানদীরু মাটি আমি। নির্মাণ কলে কম্বুপাণি।...
গঙ্গামৃত্তিকা কলে খোল। আপনে শচীর দুলাল॥ [৩২ অধ্যায়]

বাংলা 'চৈতন্য ভাগবতে' বৃন্দাবন দাস বলেছেন, আগে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ দুর্গোৎসবে বাজানো হত। পরে এগুলি কীর্তনে ব্যবহার করা হল।—

'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্বঘরে। দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্তন সময়ে। গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে॥
[মধ্য/২২]

খোল আবিষ্কারের কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্যের—ওড়িয়া গ্রন্থের এ দাবী কতটা ঐতিহাসিক সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া না গেলেও, কীর্তনের সংগতকারী বাদ্যরূপে খোলের ব্যবহার চৈতন্যই সুরু করেন, এটা ধরে নেওয়া যায়। ওড়িষায় বৈষ্ণবসমাজে খোল করতাল চালু হয় শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে—এ স্বীকৃতি আছে শ্রীচৈতন্যের ওড়িষী পঞ্চ-সখা রচিত সাহিত্যে। পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন—'তিনি (শ্রীচৈতন্য) তোমাদের খোল করতাল দিয়েছেন, তাই ওড়িয়ায় তোমরা রাসরচনা করেছ'—

'সে তুম্ভঙ্কু দেলে খোল করতাল যেহু
ওড়িশারে রাহাস রক্বিল তুম্ভে তেহু'। [গুরুভক্তিগীতা]

চৈতন্যভক্ত পার্ষদ অচ্যুতানন্দ চৈতন্যশিক্ষা সামনে রেখে তাঁর শিষ্যবর্গকে নিয়ে ওড়িষায় কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলারসের রাসরচনা-ই করেননি, চৈতন্য পন্থার অনুসরণে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে স্বাধীন ধর্মজীবনযাপনের সুযোগ ও সামাজিক মর্যাদা দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের পথ প্রশস্তও করেছেন। মানবিক বিকাশের এই অর্থেই ষোড়শ শতকের ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীচৈতন্য।—'Whatever may be the truth about chaitanya's Divinity, it is clear that he was, in actual life, Sri Krishna for the 16th century.'

['*The Vaisnavite Reformers of India*' by T. Rajagopalachari (1909)]

কেবল ওড়িষায় নয়, সমগ্র ভারতেই মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন শ্রীচৈতন্য। বাঙালী মনীষার প্রয়োগ-সার্থকতাও সেখানেই। সেক্ষেত্রেও বাঙালী মনীষার দিশারী শ্রীচৈতন্য—তাঁকে আমরা পিছনে ফেলতে পারিনি। যতদিন মনুষ্যত্বের সঙ্কট থাকবে, ততদিন তাঁর ভাবাদর্শ আমাদের সামনে সামনেই থাকবে। শ্রীচৈতন্যের অবস্থান বাঙালী মনীষার সেই অন্তরতম লোকে—অবিচ্ছেদ্য, গতিময় ও চিরন্তন।